পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৮ বর্ষ ।। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৫ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪১৭ হিঃ ।। ১৫ই আশ্বিন, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ ।। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ।। ভারত ৩ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ।।

সূচিপত্র

		পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	: 'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ—কুরআন মজীদ তেলাওয়াত	: অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	: অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪
হাকিকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	: অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৫
জুমুআর খুৎবা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	: অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১১
চলতি দুনিয়ার হালচাল—আক্রমণ ছাড়াই আক্রান্ত	: মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৩
ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে	: আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২৬
আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ ওসীয়্যত বিভাগ থেকে	: ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৭
	: এ, কে, রেজাউল করীম	৩২
কবিতা : আখেরী কারবালা মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)	অনুবাদক : : চৌধুরী আব্দুল মতিন	৩৩
মেহমাননেওয়াযী	: অধ্যাপক রাজিব উদ্দীন আহমদ	৩৪
ছোটদের পাতা	: পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৪০
সংবাদ	:	৪৫
হাসপাতাল থেকে লিখছি	: আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	৪৭
সম্পাদকীয়	:	৫১

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতারম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৮তম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ : ৩০শে তাবুক, ১৩৭৫ হিঃ শামসী : ১৫ই আশ্বিন, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্ নিসা-৪

৩৫। পুরুষগণ স্ত্রীলোকগণের উপর অভিভাবক, (৫৯৮) কেননা, আল্লাহ্ তাহাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন এবং এই কারণেও যে, তাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে (স্ত্রীলোকের জন্য) খরচ করে। সুতরাং পুণ্যবতী স্ত্রীলোকগণ অনুগতা, তাহারা (স্বামীদের) ঐসকল গোপনীয় বিষয়ের হিফাযতকারিণী যাহার হিফাযত আল্লাহ্ করিয়াছেন; এবং তোমরা যে সব স্ত্রীলোকের অবাধ্যতার (৫৯৯) আশঙ্কা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে শয্যায় পৃথক করিয়া দাও (৬০০) এবং

৫৯৮। কাওয়ামূন' কা-মা হইতে উৎপন্ন। 'কা-মা আলাল মারআতি' অর্থ সে স্ত্রী-লোকটির ভরণ-পোষণের বা রক্ষার দায়িত্ব নিল। অতএব, কাওয়ামূন অর্থ ভরণ-পোষণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপক (লিসান)। পুরুষকে দুইটি কারণে পরিবারের কর্তা বানানো হইয়াছে বলিয়া এই আয়াতে বলা হইয়াছে: (ক) পুরুষের মানসিক ও শারীরিক শক্তির আধিক্য এবং (খ) রুজি-রোজগার ও পরিবারের প্রতিপালনের সার্বিক দায়িত্ব বহন। ইহাই স্বাভাবিক—যে ব্যক্তি রোজগার করে ও পরিবারের প্রতিপালনের ও রক্ষণাবেক্ষণে নিজের উপার্জন ও শারীরিক-মানসিক শক্তি নিয়োজিত করে, সে-ই পরিবারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হইয়া থাকে।

৫৯৯। 'নাশাযাতুল মারআতু আলা যাওজিহা' অর্থ স্ত্রী তাহার স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিল, স্বামীকে প্রতিহত করিল, পরিত্যাগ করিল (লেইন এবং তাজ)।

৬০০। এই বাক্যটির অর্থ এইরূপও হইতে পারে (ক) স্ত্রী-সহবাস হইতে বিরত থাকা, (খ) পৃথক বিছানায় শয়ন করা, (গ) কথা-বার্তা না বলা। তবে এইরূপ ব্যবস্থা সাময়িক ধরনের মাত্র, অনির্দিষ্ট কালের জন্য নহে। কেননা, স্ত্রীকে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখা নিষেধ (৪:১৩০)। কুরআন অনুযায়ী সব মিলাইয়া সর্বাধিক চারিমাস পর্যন্ত উপরোক্ত (ক), (খ) ও (গ) এর ব্যবস্থাদি চলিতে পারে (২:২২৭)। স্বামী যদি সত্যই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তাহা হইলে ৪:১৬ অনুযায়ী তাহাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

তাহাদিগকে প্রহার কর। (৬০১) অতঃপর, তাহারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব উচ্চ, মহা গৌরবান্বিত।

৩৬। এবং যদি তোমরা (৬০২) তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহা হইলে স্বামীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস এবং স্ত্রীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস নিযুক্ত কর (৬০৩)। যদি তাহারা উভয় (সালিস) আপোষ করাইতে চাহে তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের মধ্যে মিল করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৩৭। আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং সদয় ব্যবহার কর—পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় ৬০৪) প্রতিবেশীগণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে, (৬০৫) তাহাদের সহিত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদৌ ভালবাসেন না যাহারা অহংকারী, দাম্ভিক;

৩৮। যাহারা স্বয়ং কৃপণতা করে এবং লোকদিগকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফযল হইতে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা গোপন করে। বস্তুতঃ আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি;

৬০১। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন কোনও মুসলমান কদাচিত যদি তাহার স্ত্রীকে অগত্যা প্রহার করিতে বাধ্যই হয়, তাহা হইলে এমনভাবে প্রহার করিবে যাহাতে স্ত্রীর গায়ে কোন দাগ না পড়ে (তিরমিযী ও মুসলিম)। কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে সে ভাল মানুষ নহে (কাসীর, ৩য় খণ্ড)।

৬০২। 'যদি তোমরা আশঙ্কা কর'-এই বাক্যাংশে 'তোমরা সর্বনামটি দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্র, মুসলিম সমাজ বা গোষ্ঠী অথবা সাধারণ সমাজকে বুঝাইয়াছে।

৬০৩। মধ্যস্থতাকারী সালিসগণ বিবদমান স্বামী-স্ত্রী-এর আত্মীয়-স্বজন হইতে নেওয়া ভাল। কেননা, তাহারা স্বামী-স্ত্রীর মতপার্থক্যের সম্বন্ধে সবিশেষ ওয়াকিফহাল থাকার কথা। তাহাছাড়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাহাদের কাছে সহজে ও নিঃসঙ্কোচে নিজেদের বিভেদের কারণাদি বলিতে পারিবেন।

৬০৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে স্ত্রীর প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল থাকিবার উপদেশ দানের পর, কুরআন একজন মুসলমানকে তাহার দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিধিকে সব মানুষের মধ্যে বিস্তৃতি ও প্রসারতা দানের তাকিদ দেয়; নিকটতম আত্মীয় হইতে দূরতম অজানা ব্যক্তিও যেন তাহার দয়া-দাক্ষিণ্য হইতে বঞ্চিত না হয়।

৬০৫। দাস, দাসী-বাঁদি, চাকর-চাকরাণী ও নিম্ন-পদস্থ, অধীনস্থ কর্মচারী।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

কুরআন মজীদ তেলাওয়াত

১। হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রাযিঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ভাল, যে কুরআন করীম শিখে ও অন্যকে শিখায়।" (বুখারী, কেতাব ফাযায়েলিল-কুরআন)

২। হযরত রাফে বিন্ মুয়াল্লা (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : "আমি কি তোমাকে মসজিদ হতে বের হওয়ার পুর্বে কুরআন মজীদের সব চেয়ে বড় সূরা শিখাব না? অতঃপর, তিনি আমার হাত ধরলেন। যখন আমরা বের হতে লাগলাম, তখন আমি বললাম : হে আল্লাহ্ র রসুল! আপনি কুরআন করীমের সবচে' বড় সূরা আমাকে শিখাবেন বলে বলেছিলেন। এতে তিনি (সাঃ) বললেন : ইহা সূরা "আল্ হামদ"। ইহা 'সাবউল মাসানী'। অর্থাৎ ইহার সাত আয়াত বার বার নাযেল হয়েছে এবং বার বার পাঠ করা হবে। ইহাই সেই 'কুরআন আযীম' (মহান কুরআন) যা আমাকে দেয়া হয়েছে।" (বুখারী, কেতাব ফাযায়েলিল কুরআন)

৩। হযরত বশীর ইব্নে মুনযির (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন : "যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ ললিত কণ্ঠে পাঠ করে না, আমাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।" (আবু দাউদ, কেতাবুস্ সালাত)

৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে বল্লেন : 'কুরআন মজীদ শুনাও'। আমি হতবাক হয়ে নিবেদন করলাম, 'আমি আপনাকে কুরআন মজীদ শুনাব! অথচ কুরআন আপনার উপর নাযেল হয়।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'অন্যের নিকট হতে কুরআন মজীদ শুনতে আমার বড় ভাল বোধ হয়'। তখন আমি 'সূরা নিসা' তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছলাম, "কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং উহাদের সকলের উপরে তোমাকে (সাঃ) সাক্ষী করব।" তখন তাঁর চক্ষু হতে টপ্ টপ্ অশ্রু ঝরতে লাগল। (বুখারী হুননুস্-সাউতে বিল্ কিরআত)

৫। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার কুরআন করীমের কোন অংশ স্মরণ নেই, সে উৎসন্ন গৃহের ন্যায়।"
(তিরমীযি, কিতাব ফাযায়েলিল কুরআন)

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হতে)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক

মৃত্যু সম্পর্কে আদৌ এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, মৃত্যু বরণ করার পর মানুষ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় (এরূপ ধারণা ঠিক) না, আর এর দৃষ্টান্ত এমন যেমন এক ব্যক্তি এক কক্ষ হতে বের হয়ে অন্য এক কক্ষে প্রবেশ করলো। এর তাৎপর্য কিছুটা স্বপ্নের মাধ্যমে বুঝা যেতে পারে। কারণ, স্বপ্নও তো আসলে মৃত্যুরই ভগ্নী। স্বপ্নেও একভাবে আত্মাকে উঠিয়ে নেয়া হয়। অন্যান্য লোকের ধারণা মতে, যারা ঘুমন্ত ব্যক্তির আশেপাশে বসা থাকে, তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ও মগ্নতার জগতে নিমজ্জিত, কিন্তু স্বপ্ন দর্শনকারী সেই সময় অন্য জগতে থাকে এবং বিচরণ করে বেড়ায়। এখন বাহ্যদৃষ্টিতে তার ইন্দ্রিয়সমূহ ও শক্তি-সমূহ সকলই কাজে ব্যস্ত। এরূপ ভাবেই মৃত্যুবরণকারী মৃত্যুর পর পরই নিজেকে অন্য এক জগতে দেখতে পায়। (মলফুযাত ৪র্থ খঃ ৩৯৩ পৃঃ)

কালামুল ইমাম

"আমি তোমার ওপরে আশীষের পর আশীষ বর্ষণ করবো এমন কি রাজা-বাদশাহ্‌গণ তোমার কাপড় থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" সুতরাং তোমরা যারা শ্রবণ করছো এ কথাগুলো মনে রেখ এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তোমরা সিন্দুকে আবদ্ধ করে রেখো, কেননা, ইহা আল্লাহ্‌তা'লার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবেই।"

"ইসলাম ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার বিশ্বাস বিনাশ প্রাপ্ত হবে। সকল অস্ত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে কেবল ইসলামের ঐশী অস্ত্র ব্যতিরেকে যা ভাঙ্গবেও না এবং ভোঁতাও হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের শক্তিকে ভস্মীভূত করে। সময় ঘনিয়ে এসেছে যখন প্রকৃত তৌহীদ (একত্ববাদ) সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এমন কি মরুভূমির অজ্ঞ অধিবাসীরাও তাদের হৃদয়ে তা অনুভব করবে।"

[হযরত ইমাম মাহদী (আঃ), তবলীগে রিসালত : ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ-৮

হাকিকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)]

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

(পূর্ববর্ত্তী সংখ্যায় উল্লেখিত দোয়ার অবশিষ্টাংশ)

অতএব হে আমার খোদা, তুমি এই সেলসেলার সাহায্যার্থে তোমার কুদরতের হাত প্রকাশ কর, যে উদ্দেশ্যে ইহা জারী করা হইয়াছে তাহা সফল কর, সত্যকে সাধারণভাবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট এবং বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিকট প্রকাশ কর, এবং তাহাদিগকে ইহার অনুবর্ত্তিতা করার তওফীক দান কর। কেননা, তুমি সর্বশক্তিমান এবং আকাশ ও পৃথিবীর অণু পরমাণুর উপর তোমার সার্বভৌমত্ব কার্যকর আছে। ইহা কি সম্ভব যে, তোমার আদেশ ব্যতীত একটি অণু পরমাণুও ক্রিয়াশীল হইতে পারে? অতএব তুমি যাহা চাহ তাহাই কর। তোমার নিকট কোন ব্যাপারই অসম্ভব নহে। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমায় ইচ্ছা অপরিবর্ত্তনীয়। তোমার দয়া চিরন্তন। তোমার কুদরত পূর্ণাঙ্গ। তোমারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী কায়েম আছে। তুমিই রাত্রির অন্ধকারের পর ভোরের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করিয়া দাও এবং সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে টানিয়া আন। তুমিই পৃথিবীতে বিপ্লব সাধন কর। তুমিই কাউকে কাউকে রাজ সিংহাসনে এবং কাউকে কাউকে ছাইভস্মের উপর বসাইয়া দাও। তুমিই সত্য মিথ্যার মধ্যে ফরসালা করিতে পার। তুমিই এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর, সত্য প্রকাশ কর, তোমার সৃষ্ট মানুষকে গোমরাহীর মৃত্যু হইতে রক্ষা কর, এবং তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আমীন। সুম্মা আমীন।"

ইহাই চেরাগদীনের মোবাহালার ভাষ্য, যাহাতে সে আমাকে তাহার বিপক্ষ সাব্যস্ত করিয়া এবং আমাকে দাজ্জাল ঘোষণা করিয়া খোদাতা'লার ফয়সালা চাহিতেছে। সে আমাকে একটি ফেৎনা ঘোষণা করিয়া আমাকে উঠাইয়া নেওয়ার জন্য আবেদন করিতেছে এবং আমার বিনাশ চাহিতেছে। সে দোয়া করিতেছে যে, হে খোদা, তোমার কুদরতে হাত প্রকাশ কর। অতএব আলহামদুলিল্লাহ্। এই মোবাহালার একদিন পরে খোদাতা'লা তাঁহার কুদরতের হাত দেখাইয়া দিলেন। এই মোবাহালার কপি প্রেসের প্লেটে উঠানোর পূর্বেই ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে এই যালেমকে তাহার দুই পুত্র সহ খোদা ধ্বংস করিয়া দিলেন। ইহা হইল খোদার কাজ। ইহা হইল খোদার অলৌকিক কাজ। ইহা হইল খোদার কুদরতের হাত। فاعتبروا يا اولى الابصار (অর্থ : হে দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি, শিক্ষা গ্রহণ কর—অনুবাদক)।

১৭৫ নং নিদর্শন : একবার 'বেরাদরে হিন্দ' পত্রিকার সম্পাদক সোনা রায়েন অগ্নি হোত্রী সাহেবের একটি চিঠি লাহোর হইতে আসার কথা ছিল। ইহাতে সে লিখিয়াছিল যে, আমি বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় খণ্ডের জবাব লিখিব যাহার মধ্যে ইলহাম আছে। ঘটনা-ক্রমে ঐ চিঠি পৌঁছার পূর্বেই ঐ দিনেই, বরং ঐ মুহূর্তেই যখন সে লাহোরে তাহার চিঠি লিখতে ছিল, খোদাতা'লা আমাকে কাশ্‌ফের মাধ্যমে ঐ চিঠি সম্পর্কে অবগত করাইলেন এবং কাশ্‌ফের মধ্যেই ঐ চিঠি আমার সম্মুখে আসিয়া গেল এবং আমি উহা পড়িলাম। ঐ সময় ঐ সকল আর্য, যাহাদের কথা কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদিগকে এই চিঠির বিষয়-বস্তু সম্পর্কে ঐ দিনই চিঠি আসার পূর্বেই জানাইয়া দিলাম। পরের দিন তাহাদের মধ্য হইতে এক আর্য চিঠি আনার জন্য পোষ্ট অফিসে গেল। তাহার সম্মুখেই ডাকের থলি হইতে ঐ চিঠি বাহির করা হইল। যখন ঐ চিঠি পড়া হইল তখন দেখা গেল যে, চিঠিতে হুবহু ঐ বিষয়-বস্তুই ছিল যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছিলাম। তখন ঐ সকল আর্য অত্যন্ত অবাক ও হতবাক হইয়া গেল। তাহারা আজো জীবিত আছে। হলফ্‌ করাইলে তাহারা সত্য কথা বর্ণনা করিতে পারে।

১৭৬ নং নিদর্শন : যখন আমি প্রাঞ্জল ভাষায় 'ইজাযুল মসীহ' গ্রন্থটি লিখিলাম তখন খোদাতা'লার নিকট হইতে ইলহাম পাইয়া এই ঘোষণা প্রকাশ করিলাম যে, এইরূপ প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থের দৃষ্টান্ত কোন মৌলবী পেশ করিতে পারিবে না। তখন পীর মেহের আলী নামক এক ব্যক্তি (সাকিন গোলড়া) এই গাল-গল্প প্রচার করিল যে, সে এইরূপই একটি গ্রন্থ লিখিয়া দেখাইবে। ঐ সময় খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমার নিকট ইলহাম হইল مانع من السماء অর্থাৎ একজন নিষেধকারী আকাশ হইতে তাহাকে দৃষ্টান্ত পেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তখন সে সম্পূর্ণরূপে নির্বাক ও লাজওয়াব হইয়া গেল। যদিও সে সাধারণ মানুষের ন্যায় উর্দুতে বকাবকি করিতে থাকিল তথাপি আরবী গ্রন্থের দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত লিখিতে পারে নাই।

১৭৭নং নিদর্শন : আমার গৃহ সংলগ্ন দুইটি গৃহ ছিল। ঐগুলি আমার দখলে ছিল না। কিন্তু সংকীর্ণ গৃহের দরুন আমার প্রশস্ত গৃহের প্রয়োজন ছিল। একবার আমাকে কাশ্‌ফে দেখানো হইল যে, এই জমির উপর একটি বড় মঞ্চ আছে। আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইল যে, এই জায়গায় একটি লম্বা দালান উঠিবে। আমাকে আরো দেখানো হইল যে, এই জমির পূর্বাংশ আমার ইমারত নির্মাণের জন্য দোয়া করিয়াছে এবং পশ্চিমাংশের দূরের ও নিকটের জমি 'আমীন' বলিয়াছে। বস্তুতঃ আমার জামাতের শত শত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ এই কাশ্‌ফ শুনাইয়া দেওয়া হইল এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হইল। ইহার পর এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, ঐ দুইটি গৃহ ক্রয় ও উত্তরাধিকারের মাধ্যমে আমার অংশে আসিয়া

গেল এবং উহাদের কোন কোন অংশে মেহমানদের জন্য ঘর বানানো হইল। অথচ ঐ-গুলি আমার দখলে আসা অসম্ভব ছিল এবং কেহ ধারণা করিতে পারিতেছিল না যে, এইরূপ ঘটনা ঘটিবে। আল্ হাকাম পত্রিকার ৭ম খণ্ডের * ৪৬ ও ৪৭ নম্বর এবং আল্ হাকামের ৮ম খণ্ডের ৩ নম্বর দেখ।

১৭৮ নং নিদর্শন : একবার পাটিয়ালা রাজ্যের মন্ত্রী খলীফা সৈয়্যদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব তাহার কোন অস্থিরতা ও মুস্কিলের সময় তাহার জন্য দোয়া করিতে আমার নিকট চিঠি লিখিলেন। যেহেতু তিনি কয়েকবার আমার সেলসেলার খেদমত করিয়া ছিলেন, সেজন্য তাহার জন্য দোয়া করা হইল। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে ইলহাম হইল :

چلی رہی ہے نسیم رحمت کی   جو دعا کیجئے قبول ہے آج

(অর্থ : রহমতের মৃদু মন্দ হাওয়া বহিতেছে। যে দোয়া করা হইয়াছে তাহা আজ কবুল হইল)। এই দোয়ার পর খোদাতা'লা স্বীয় ফযলে তাহার ঐ মুস্কিল দূর করিয়া দিলেন এবং তিনি শোকরগুযারীর চিঠি লিখিলেন। এই ঘটনার সাক্ষী ঐ চিঠিই, যাহা আমার কোন এক বাক্সে মজুদ আছে। ইহার আরো কয়েকজন ব্যক্তি সাক্ষী আছে। বরং ঐ সময় শত শত মানুষের মধ্যে আমার এই ইলহাম জানাজানি হইয়া গিয়াছিল। বাজারের জমিদার নবাব আলী মোহাম্মদ খান মরহুমও তাহার স্মৃতি হইতে এই ঘটনা লিখিয়া লইয়া ছিলেন।

১৭৯ নং নিদর্শন : গুরুদাসপুরে দায়েরকৃত মামলায় করমদীনের মোকদ্দমায় সে এই কথার উপর জোর দিতেছিল যে, 'লয়ীম' (অর্থ :—নীচ— অনুবাদক) শব্দটির অর্থ হারামজাদা এবং 'কাজ্জাব' (অর্থ : মিথ্যাবাদী—অনুবাদক) এর অর্থ যে সর্বদা মিথ্যা বলে। এই অর্থই প্রথম আদালত গ্রহণ করিয়া ছিল। ঐ সময় আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে আমার নিকট ইলহাম হইল معنی دیگر پسند ما نیست (অর্থ:—অন্য অর্থ আমাদের পসন্দ নয়—অনুবাদক)। ইহা হইতে বুঝিলাম যে, অন্য আদালতে এই অর্থ টিকিবে না। বস্তুতঃ এইরূপই হইল। আপীলের আদালতে ডিভিশনাল জজ সাহেব এই সকল খোঁড়া যুক্তি রদ করিয়া দিলেন। তিনি এই কথা লিখিলেন। 'কাজ্জাব' ও 'লয়ীম' শব্দ দুইটি কমরদীনের জন্য প্রযোজ্য। বরং সে ইহার চাইতেও কঠোর শাস্তির যোগ্য। অতএব ডিভিশনাল জজ সাহেব কমরদীনের জন্য ঐ কৃত্রিমতাপূর্ণ অর্থ পসন্দ করিলেন না, যাহা প্রথম আদালতে পসন্দ করা

---

* টীকা : মূল পুস্তকে খণ্ডের নম্বর লিপিবদ্ধ ছিল না। এখন লিপিবদ্ধ করা হইল : প্রকাশক।

হইয়াছিল। আল্ হাকাম পত্রিকার ৮ম খণ্ডের * ৭ নম্বর, ১৯০৪ সালের ২৪শে মে সংখ্যা দেখ, যাহাতে এই ইলহাম মজুদ আছে।

১৮০ নং নিদর্শন : একবার ১৯০২ সালে আমার নিকট ইলহাম হইল :

يريدون ان يطفئوا نورك - ويتخطفوا عرضك - واني معك و مع اهلك -

অর্থাৎ দুশমনেরা তোমার জ্যোতিকে নিভাইয়া দিতে ও তোমার সম্মান হানি করিতে সংকল্প করিবে। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকিব এবং তাহাদের সঙ্গে থাকিব যাহারা তোমার সঙ্গে থাকে। ঐ সময় আমি দেখিলাম আমি একটি গলিতে আছি, যাহা সম্মুখে বন্ধ। গলিটি এতই সংকীর্ণ যে, এক ব্যক্তি মুশকিলে ইহা অতিক্রম করিতে পারে। আমি বন্ধ গলির শেষ অংশে ছিলাম, যাহার পরে আর কোন পথ ছিল না। আমি প্রাচীরের সাথে দাঁড়াইলাম। যখন আমি ফিরিয়া যাওয়ার জন্য যে রাস্তা ছিল উহার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইলাম তখন দেখিলাম যে, সেখানে তিনটি ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট সাণ্ডা দাঁড়াইয়া আছে। উহারা ছিল ঘাতক সাণ্ডা এবং যাওয়ার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি আমার দিকে হামলা করিয়া দৌড়াইল। উহাকে আমি হাত দ্বারা হটাইয়া দিলাম। ইহার পর দ্বিতীয়টি হামলা করিল। উহাকেও আমি হাত দ্বারা হটাইয়া দিলাম। অতঃপর তৃতীয়টি এত ভয়ঙ্কররূপে উত্তেজনার সহিত আসিল যে, উহাকে দেখিয়া মনে হইতে ছিল এখন আর নিস্তার নাই। কিন্তু যখন উহা আমার নিকটে আসিল তখন উহা প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং আমি উহার পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া গেলাম। এই সময় আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হইতে কয়েকটি কথা আমার হৃদয়ে এল্‌কা হইল। ঐগুলি পড়িতে পড়িতে আমি দৌড়াইতে ছিলাম। কথাগুলি হইল :

رب كل شي خادمك رب فاحفظني وا نصرني وارحمني

(অর্থ : হে আমার প্রভু, সকল বস্তু নিচয় তোমার সেবক। হে আমার প্রভু, আমাকে হেফাযত কর এবং আমাকে সাহায্য কর ও আমার উপর করুণা কর—অনুবাদক)। এই ঘটনা দেখার সাথে সাথেই আমাকে বুঝানো হইল যে, কোন দুশমন আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করিবে এবং তাহার তিনজন উকিল থাকিবে। এই মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বেই এই ইলহাম ও কাশ্‌ফ ১৯০২ সালের আল্-হাকাম অর্থাৎ ২৪ নম্বর আল্-হাকামে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হইল। ইহার পর কমরদীন ঝিলামে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিল এবং আমাকে তলব করা হইল। ঐ মোকদ্দমা ছিল ভয়ানক এক ফৌজদারী মোকদ্দমা। কাশ্‌ফী অবস্থায় যেভাবে দেখানো হইল সেভাবেই তাহার তিনজন উকিল ছিল। অবশেষে

* টীকা : মূল পুস্তকে খণ্ডের সংখ্যা লিপিবদ্ধ ছিল না। এখন লিপিবদ্ধ করা হইল। প্রকাশক।

খোদার ওয়াদা অনুযায়ী তাহার ঐ মোকদ্দমা খারিজ হইল। ১৯০২ সালের আল্ হাকাম পত্রিকার ২৪ নম্বর, ৬ষ্ঠ খণ্ড * দেখ।

১৮১ ☐ নং নিদর্শন ঃ খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দেন যে, তোমার গৃহে একটি মেয়ের জন্ম হইবে ও মরিয়া যাইবে। তাহার নাম 'গাসেক' রাখা হয়। অর্থাৎ অন্তগামী। ইহার এই কথার প্রতি ইঙ্গিত দিল যে, সে শিশুকালেই মরিয়া যাইবে। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মেয়ের জন্ম হইল এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শিশু কালেই সে মরিয়া গেল। আল্ হাকাম পত্রিকার ৪ নম্বর, ৭ম খণ্ড দেখ।

১৮২ নং নিদর্শন ঃ মৌলবী মোহাম্মদ ফযল সাহেব আহমদী, রাওয়ালপিণ্ডি জিলার গুজার খান তহসিলের অন্তর্গত চুঙ্গা গ্রাম হইতে লেখেন যে, আমি রাওয়ালপিণ্ডি জিলার গুজার খান তহসিলের অন্তর্গত চুঙ্গা গ্রামে ১৯০৪ সালের মে মাসে একদিন যখন কয়েকজন লোকের সহিত, যাহাদের মধ্যে কোন কোন আহমদী ও কয়েকজন অ-আহমদীও অন্তর্ভুক্ত ছিল, জুমু'আর নামায পড়িয়া মসজিদে বসিয়াছিলাম, তখন চুঙ্গা গ্রামের মাতব্বর ফযলদাদ খান নামক এক ব্যক্তি অন্য কোন একজন লোকের উস্কানিতে মসজিদে আসিয়া আমাকে ও অন্যান্য আহমদীদিগকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিল। ফযলদাদ খান আমার একজন প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের মধ্যে অন্যতম। সে বলিল, তোমরা মসজিদে নামায পড়িয়া মসজিদকে অপবিত্র করিয়া দিয়াছ। অতঃপর সে আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যকার বিতর্কিত ছোট

---

* টীকা ঃ মৌলবী কমরদীন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আল্ হাকাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার সার-সংক্ষেপ এই যে, একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় নিম্ন আদালত আমার বিরুদ্ধে রায় দিবে, কিন্তু উচ্চ আদালতে আমি খালাস হইয়া যাইব। বস্তুতঃ কমরদীন যখন গুরুদাসপুরে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিল তখন নিম্ন আদালত অর্থাৎ আত্মা রামের কোর্ট আমার পাঁচশত টাকা জরিমানা করিল। অতঃপর উচ্চ আদালত অর্থাৎ ডিভিশনাল জজ সাহেবের কোর্ট ঐ আদেশ বাতিল করিয়া সসম্মানে আমাকে খালাস করিয়া দিল। সম্মানিত রায়দাতা লেখেন যে, করমদীন সম্পর্কে যে দুইটি শব্দ 'কাজ্জাব' ও 'লয়ীম' ব্যবহার করা হইয়াছে উহা সমীচীন। করমদীন এই শব্দ দুইটির যোগ্য ; বরং যদি এই শব্দ দুইটির চাইতেও অধিক কঠোর শব্দ করমদীন সম্পর্কে লেখা হইত তবে সে ঐ শব্দগুলিরও যোগ্য হইত। এইরূপ শব্দ দ্বারা করমদীনের কোন মানহানি হয় নাই। এই ভবিষ্যদ্বাণী নির্ধারিত সময়ের বহুপূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছিল।

☐ টীকা ঃ এই নিদর্শনটি পূর্বেও লেখা হইয়াছে। কিন্তু এখন আরো ব্যাখ্যার জন্য ইহা পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

খাটো মসলা-মাসায়েল তুলিয়া আমার সহিত বিবাদ শুরু করিয়া দিল। আমি তাহাকে মৌখিক-ভাবে ও লিখিতভাবে বুঝাইলাম এবং তাহাকে দোষী প্রমাণ করিলাম। কিন্তু সে আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতেই থাকিল। তাহার উসকানীর দরুন জনগণকে আমি আহমদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত দেখিতে পাইলাম। যখন আমি দেখিলাম যে, ঐ ব্যক্তি ফেতনা-ফাসাদ হইতে বিরত হইতেছে না, তখন আমার হৃদয়ে ভয়ানক অস্থিরতা দেখা দিল যে, খোদাতন্দ, এখন এই বিষয়টির কীভাবে সুরাহা হইবে। এই ব্যক্তির মাধ্যমে বড় ধরনের ফেতনা-ফাসাদ শুরু হইবে। তখন আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, আমি যে সকল মসলা-মাসায়েল বর্ণনা করিতেছি যদি ঐগুলিতে আমি মিথ্যাবাদী হই তবে খোদাতা'লা তোমার পূর্বে আমাকে মৃত্যু দিবেন এবং যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে খোদাতা'লা তোমাকে মৃত্যু দিবেন। তখন ফযলদাদ খান এই বলিয়া আমাকে জবাব দিল যে, খোদা তোমাকে মৃত্যু দিন। আমি তখনই মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম এবং লোকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। অতঃপর কয়েকদিন পরে উল্লেখিত ব্যক্তি (অর্থাৎ ফযলদাদ খান) ভয়ানক কোমরের ব্যথায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং দশ মাসের মধ্যে ১৯০৬ সালের ২৪শে মার্চ মরিয়া গেল। তাহার মৃত্যু দ্বারা সে আহমদীয়া জামাতের সত্যতার নিদর্শন স্মৃতিরূপে ছাড়িয়া গেল। কিছু কাল পর্যন্ত মজলিসে মোবাহালায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাহার মৃত্যু এক ত্রাস ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমি আমার বিরুদ্ধবাদীদের নিকট হইতে ও নিজের কানে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, এই ব্যক্তির মৃত্যু নিদর্শনস্বরূপ হইয়াছে।

বিনীত দাস

খাকসার মোহাম্মদ ফযল আলী আহমদী, গ্রাম চুঙ্গা, তহসিল গুজার খান,
জিলা রাওয়ালপিণ্ডি, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সাল।

মৃত্যুর মোবাহালার সাক্ষী ফযলদাদ খান
নেযাম উদ্দীন দর্জী টিপ সহি
সাক্ষী শামুলী খান, স্বহস্ত লিখিত
উপরোক্ত বর্ণনা সত্য

সাক্ষী ফযল খান স্বহস্ত লিখিত
উপরোক্ত বর্ণনা সত্য

(ক্রমশঃ)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ করো তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয় কীট, তাঁকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নয় মৃত।" (হযরত ইমাম মাহদী (আঃ), হাকিকাতুল ওহী, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩০শে আগষ্ট, ১৯৯৬ইং, মিউনিখে (জার্মানী) প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর সূরা আল্-যুমার : ৫৪তম আয়াত তেলাওয়াত করেন :

قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا - انه هو الغفور الرحيم ○

[অর্থ : তুমি বল, "হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করিয়াছে, তোমরা আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।]

অতঃপর হুযূর বলেন : উক্ত আয়াতটি সম্পর্কে আমি ইনশাআল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তু বিশদভাবে বর্ণনা করবো এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণীর একটি উদ্ধৃতির সূত্রে আপনাদেরকে কিছু উপদেশ দান করবো। কিন্তু আপাততঃ জার্মানী জামাতের সফর-লব্ধ আমার অভিজ্ঞতা ও অভিমত ব্যক্ত করার মাধ্যমে এই খোৎবাটি শুরু করছি। খোদাতা'লার ফযলে এই সফর সবদিক দিয়ে বরকতমণ্ডিত (সাব্যস্ত) হয়েছে। জার্মানীর জামাতকে বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখার ও পরখ করার সুযোগ পেয়েছি এবং অত্যন্ত স্বস্তি ও আত্মতৃপ্তি সহকারে খোদাতা'লার সমীপে কৃতজ্ঞতাভরা আবেগ অনুভূতির সাথে বলতে পারি যে, এবছরও পূর্ববৎ জার্মানী জামাতের কদম উন্নতির দিকে অগ্রসরমান দেখেছি এবং আল্লাহ্তা'লার ফযলে সর্বস্তরে দুর্বলতাসমূহ দূর করার এবং নবতর সৌন্দর্য সৃষ্টি করার দিকে অব্যাহত ধারায় নিবিষ্ট তাদের মনোযোগ প্রত্যক্ষ করেছি। সুতরাং সালানা জলসায় যোগদানকারী বহিরাগত সকল মেহমানরা সাক্ষীও রয়েছেন এবং তারা আমার সামনে উল্লেখও করতে থাকেন যে, "যতটুকু (জার্মানী জামাত সম্পর্কে) আমরা শুনেছিলাম তার চেয়েও (তাদেরকে) উত্তম পেয়েছি।" সর্বাত্মকভাবে নিজেদেরকে কর্মব্যস্ত রেখে রাত দিন একাকার করে জার্মানী জামাত এতো উন্নত মান স্থাপন করেছে যে, (বহিরাগত মেহমানদের) অনেকেই বলছিলেন, "আমরা তো ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করছিলাম ; আমরা ভেবেছিলাম আমরা উত্তম কর্মী, কিন্তু এখানে তার চেয়েও উত্তম কাজ পরিদৃষ্ট হলো।" এবারও জলসাকালীন

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মান অসাধারণ রূপে উঁচু ছিল। সর্বক্ষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ যুগপৎ এরূপ ধারায় অব্যাহত ছিল যে, কর্মীদের দেখা যেত না, কেবল পরিচ্ছন্নতাই দেখা যেত। অত্যন্ত নীরবে এবং অত্যন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে, যথাসম্ভব রাতে যখন মেহমানরা অবসর হতেন (শুয়ে পড়তেন) তখনও তারা পরিচ্ছন্নকরণ কাজ করতেন এবং জলসা চলাকালীনও। এছাড়া সার্বিক খেদমত ও দায়িত্বের যদ্দুর সম্পর্ক তা এক বিশাল কর্তব্যের ভার তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। যেমন, বহিরাগত মেহমানগণ ব্যতীত জার্মানীতে নবদীক্ষিত আহ্‌মদীদের খিদমতের দাবী ও চাহিদা ব্যাপক পরিধিতে বিস্তৃত ছিল। তাঁদের মাঝে আরবরাও ছিলেন, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অধিবাসীগণও ছিলেন। তাঁদের মাঝে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন জাতির লোক ছিলেন এবং তাঁরাও, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে স্থায়ীভাবে জার্মানীতে বসবাস করেন। এদের সবার জন্যে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অতি উত্তম রূপে করা হয়। কর্মীদের যে টিমই যে খিদমতের কাজেই নিয়োজিত ছিল তারা প্রত্যেকেই তা অত্যন্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতার সাথেই নয়, বরং পরম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। সুতরাং আমাদের কাফিলার সদস্যরা যারা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিলেন তাদের প্রত্যেকের ঐ বিশ্বাস ও অভিমতই ছিল।

ইংল্যাণ্ডেও খোদাতা'লার ফযলে খিদমতের মান উন্নত হচ্ছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমানদের মর্যাদা দেয়া হয়, সম্মান ও সদ্ব্যবহার করা হয়। কিন্তু একটা পার্থক্য আছে—যে সকল মেহমান ইংল্যাণ্ড সালানা জলসার সময় বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ লণ্ডনে (আহমদীদের গৃহে) অবস্থান গ্রহণ করেন তা তারা বেশীর ভাগ আত্মীয়তা সম্পর্কের কারণে এবং পুরাতন সম্পর্কাবলীর ভিত্তিতে করে থাকেন। সেজন্যে তাদের সাথে যে সদ্ব্যবহার হয় তা একমাত্র মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান হওয়ার সম্পর্কের দরুন নয়। সেটা যদি না-ও থাকতো তবুও আত্মীয়দের (এবং পুরাতন বন্ধুদের) সেবা (ও আতিথেয়তা) করা আমাদের প্রাচ্য-সভ্যতার অংশবিশেষ এবং এক রকম স্বাভাবিক আগ্রহের সাথে উভয় দিক থেকে আনন্দ উপভোগ করার মধ্য দিয়ে এই খিদমত পালন করা হয়, কিন্তু এখানে যে অভিজ্ঞতার কথা আমি বর্ণনা করছি তা হচ্ছে, বিভিন্ন পরিবারের লোকদেরকে যে সব পরিবারের মধ্যে (মেহমান হিসেবে) রাখা হয়েছিল তাদের মাঝে (ওরূপ) কোন সম্পর্ক ছিল না। বহু ভ্রমণ-স্থলেও পাঠানো হয়। সেখানেও তারা ইতোপূর্বে পরস্পর পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু যেভাবে স্বাগতিকগণ খিদমত করেছেন, সে সম্পর্কে বহিরাগত মেহমানগণ আমাকে জানিয়েছেন, "সত্যি-সত্যি আমরা এরূপ বোধ করছি যেন আমরা তাদের অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি, যাদের জন্যে তারা পথ চেয়ে অপেক্ষমান ছিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর সবকিছু আমাদের (সেবায়) পেশ করে দেন। তাদের বাচ্চারাও আমাদের সাথে মহব্বতের

সাথে মেলা-মেশা করে। তাদের বড়রা আমাদের সেবা করেন। কখনও তারা তাতে ক্লান্ত হন নি। তাদের চেহারায় অবিরাম আনন্দচিত্ততার স্ফুরণ প্রতিভাত ছিল। ইহা সেই সৌন্দর্য ও সদগুণ, যা আল্লাহতা'লা প্রেমের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অতএব, আমি জার্মানীর জামাতকে মোবারকবাদ জানাই।

আমি পূর্বেও একাধিকবার সেই ঘটনা বর্ণনা করেছি, যে ঘটনাটিতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়কালে (তাঁর এক সাহাবী কর্তৃক) এক অতিথি সেবার সম্পর্কে আল্লাহ্তা'লা তাঁকে (সাঃ) জ্ঞাত করেন, (সংবাদ দেন)। এক বর্ণনাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ আসমানে তখন হাসছিলেন, যখন সে অতিথি-সেবক সাহাবী ঐরূপে খিদমত করছিলেন। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী, যখন তিনি মেহমানকে ইহা বুঝাবার জন্য যে তিনিও যেন তার সাথে খাচ্ছেন, (অন্ধকারে) মুখে শব্দ করছিলেন, তখন আল্লাহ্তা'লাও আসমানে তেমনি মুখে শব্দ করছিলেন। ইহাও আল্লাহ্তা'লা কর্তৃক তাঁর বান্দাদের প্রত্যেক সৌন্দর্য ও সদাচারে সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপের অতি মহান এক প্রকাশভঙ্গী। নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্তা'লা তো কখনও মুখে ওরূপ শব্দ করেন না যেমন আমরা (খাওয়ার সময়) করে থাকি। অথবা সে অর্থে কখনও হাসেন না, যেমন আমরা হেসে থাকি। এ হচ্ছে মানুষের বাকভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা। সেজন্যে আঁ-হযরত (সাঃ)ও ঐ বাক্ধারা ব্যবহার করে ওরূপ ভাষায় আমাদের অন্তঃকরণকে এই বাণী প্রদান করেছেন, যাতে আমাদের অন্তর আল্লাহ্র প্রেমে বাঁধা পড়ে। এর চে' উত্তম ভঙ্গীতে উক্ত বিষয়টি অভিব্যক্ত করা সম্ভব ছিল না। নচেৎ, ওরূপ কল্পনা কখনো মনে স্থান দিবেন না যে, নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্-তা'লা আসমানে এরূপে বসে আছেন যে কেউ মুখে শব্দ করলে তিনি তার সাথে শব্দ করে দেন। বস্তুতঃ তিনি তো সেই খোদা যিনি গরীবদের সাথে গরীব হয়ে যান। তাঁর খিদমতকারী বান্দাদের সাথে তাদের খিদমতে শামিল হয়ে যান। তাঁর যে মহিমা এর মধ্যেই নিহিত যে, তিনি তাঁর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বান্দার দিকেও নত হতে পারেন। এবং এটাই হচ্ছে তাঁর মাহাত্ম্যের কাহিনী। যারা তার ইহ্সান ও কৃপা-পাশে আবদ্ধ, যারা তাঁর গণনাতীত ইহ্সানের কখনও শোকর আদায়ে সক্ষম নয়—তাঁরই ঐ বান্দাদের কোন তুচ্ছ একটি বিষয়কেও কদর করেন। মহান আল্লাহ্র এই হচ্ছে অতুলনীয় সৌন্দর্য তিনি যে তাঁর দুর্বল থেকে দুর্বলতর বান্দাদের মধ্যে কোনও ভাল বিষয় অবলোকন করে নিজে তাদের দিকে নত হন এবং নত হয়ে তাকে ধরে উপরে তোলেন, উচ্চ শিখরে উন্নীত করেন। এর মাঝেই তাঁর মাহাত্ম্য প্রতীয়মান হয়। অতএব, এই যে মেহমান-নেওয়াযী বা আতিথেয়তার সদগুণটি রয়েছে, —যেমন কিনা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উদ্ধৃতির সূত্রে আপনাদের অবহিত করেছি, ইহার সম্পর্কেও(মনে রাখতে হবে যে,) আল্লাহ্ কর্তৃক উপেক্ষিত

হতে পারে, ইহা তেমন কোন গুণ নয়। বরং ইহা এক অতি জ্যোতিষ্মান সদগুণ। আসমান থেকে ইহার উপর দৃষ্টি পতিত হয়। কিন্তু এর কার্যকারণ "লিল্লাহ্" (—একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে) হওয়া চাই। নইলে, অসংখ্য অতিথি-সেবা আছে, যা আত্মীয়তার খাতিরে, প্রীতি ও ভালবাসার খাতিরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, বাধ্যবাধকতার দরুন, লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। ওসব অতিথি-সেবার কোনও কদর আসমানে করা হয় না। কিন্তু যা আল্লাহ্‌র খাতিরে করা হয় সে আতিথেয়তা "পার্থিব" থাকে না, উহা বরং "ঐশী" হয়ে যায়। অতএব, আঁ-হযরত (সাঃ) উল্লেখিত হাদীসটিতে যা বলেছেন তা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ্‌তা'লারও প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি তার উপর পতিত হচ্ছিল। অতএব অতিথি-পরায়ণতার এই সদগুণটিকে আরও বাড়ান; আরও প্রসারিত ও জ্যোতির্ময় করুন। কেননা, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইহাকে এই জামাতের পাঁচটি মৌলিক শাখার মধ্যে একটি শাখা বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইহা এক বিস্ময়কর বিষয় যে, হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) এই জামাতের "ইলাহী কারখানা"—ঐশী-ব্যবস্থাপনা স্থাপনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে উহার যে পাঁচটি শাখা বা বিভাগ বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি মেহমান-নেওয়াযীকে নির্ধারণ করেছেন। ইহা এক ভবিষ্যদ্বাণীর রূপও বহন করছিল। কেননা, মেহমান-নেওয়াযীর সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিস্তার ও প্রসার লাভের এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। অতঃপর, সমগ্র জগতকে একটি হাতের উপর একত্রীকরণ ও এই জামাতের অতিথি সেবার চারিত্রিক সদগুণটির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বিশ্বব্যাপী যেখানে জলসা উদ্‌যাপন করা হয় সেখানে সচরাচর, বিশেষতঃ আজ যখন অত্যন্ত বিপুল সংখ্যায় নবদীক্ষিত 'মেহমানগণ' আগমন করছেন, তখন মেহ্‌মান-নেওয়াযীর মান উঁচু হয়ে পড়ে, দায়িত্বাবলী বেড়ে যায়। আল্লাহতা'লার কী মহিমা যে, তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে ঐ যুগে, যখন আঙ্গুলে গণা যায় এরূপ মুষ্টিমেয় লোকদের আগমনের কেবল সূচনাই ঘটেছিল তখন সমগ্র জামাতকে এক মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে দিক-নির্দেশনা করেন এবং নির্দেশ দেন যে, আগন্তুক মেহমানদের প্রতি খেয়াল রেখো। এবং স্বয়ং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর স্বয়ং এ বিষয়ের দিকে এতো খেয়াল ছিল যে, মানুষ হতবাক হয়ে পড়ে। সুতরাং কাদিয়ানে একবার জলসার দিনগুলোতে কতিপয় মেহমান, যারা না খেয়ে শুয়ে পড়ে ছিলেন অথবা শুতে যাচ্ছিলেন, (তাদের সম্পর্কে) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা ইলহামযোগে জানালেন:

اطعم الجائع و المعتر

—"যারা অভুক্ত এবং দুঃখক্লিষ্ট, তাদেরকে আহার করাও।" তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অস্থির হয়ে বেরিয়ে আসলেন। গভীর রাতে উঠে এসে ঘোষণা করালেন

যে, "অলি-গলিতে ঘোষণা করে দাও যে, কারা অভুক্ত রয়েছে। তাদেরকে আহার করান হবে।" অতএব, রাতে ঐ লোকদেরকে ডেকে তুলে খাবার পেশ করা হয়।

অতএব, মেহমান-নেওয়াযী বা অতিথিপরায়ণতার যে আমি প্রশংসা (ও গুরুত্ব) বর্ণনা করছি, ইহা কোন মামুলি বিষয় নয়। আহমদীয়া জামাতের সাথে ইহা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এবং আমাদের ভবিষ্যতের সাথে গভীরভাবে ইহা জড়িত। মেহমান-নেওয়াযীর দ্বারাই আমাদেরকে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে। জলসা এবং ইজতেমায় আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামা'ত পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অতিথিপরায়ণ হয়ে গড়ে উঠছে। এই যে দ্বিতীয় দিকটি, ইহাও অধিকতর শোক্‌র করার যোগ্য। নচেৎ, মানুষ অতিথি সেবা তো করে থাকে, কিন্তু কয়েক দিন পর, কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ খোদাতা'লার ফযলে একশ' বছরেরও অধিককাল অতিবাহিত হয়ে গেলেও এই জামাত ক্লান্তও হয় নি, শান্তও হয় নি। বরং প্রতিবছর পূর্বাপেক্ষা এই জামা'তের ভেতর অতিথিপরায়ণতার চারিত্রিক গুণ বিকশিত হতে থাকে, অধিকতর সতেজ ও দীপ্তিমান হতে থাকে। অতএব, এই উন্নত সদগুণটির হিফাযত করুন। এবং বিশ্বব্যাপী যেহেতু এই জুমুআর খোৎবা (এমটিএ-র মাধ্যমে) প্রচারিত হচ্ছে সেজন্য আপনাদের জার্মানীর জামা'তের উদ্ধৃতি সূত্রে সকলকে এই বাণী ও বার্তা প্রদান করছি যে,

لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

—প্রত্যেকেরই একটা না একটা লক্ষ্যস্থল থাকে। খোদাতা'লা (তোমাদের জন্যে) একটি লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকের একটা দৌড় লাগাবার নিশানা আছে। তোমাদের জন্যে দৌড়ের নিশানা নির্ধারণ করা হয়েছে সকল পুণ্য কাজে ও সদগুণে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আগে বেড়ে যাওয়ার চেষ্টা কর। অতএব, আমি আশা করি যে, আল্লাহ্‌তা'লা সমগ্র জামাত'কে এই (সদগুণ ও পুণ্যের) ক্ষেত্রেও নিজেদের কেবল দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করেই সম্পাদন করার তৌফিক দিবেন না, বরং মহব্বত ও আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে ফরয (অবশ্য করণীয়) কর্তব্যসমূহ পালনের তৌফীক দান করবেন। (কর্তব্যপরায়ণতার সাথে) অন্তর ও আত্মার আবেগ ও অনুভূতি ঢেলে দিয়ে এই খিদমতসমূহ পালনের তৌফীক দিবেন। কেননা, অন্তর ও আত্মার সহযোগে যদি পালন করা হয় তাহলে সেসব খিদমত বোঝাস্বরূপ হয় না। বরং সেগুলো আনন্দ ও আত্ম-তৃপ্তিস্বরূপ উপভোগের কারণ হয়ে যায়। অতএব, যে-সব কাজ দীর্ঘ মেয়াদী হয়, সুদূর বিস্তৃত যে-গুলোর কর্ম সূচী হয়ে থাকে, সে-সব ক্ষেত্রে এরূপ পরিশ্রম যা বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, সে-সব কাজ সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী চলতে পারে না। অতএব, আমাদের স্থিতিশীলতার রহস্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাঝেই নিহিত। নিজেদের নেক কাজসমূহকে সদাসর্বদা কায়েম রাখার চাবিকাঠি এটাই

যে, ঐ নেক কাজগুলোকে যেন আমরা ভালোবাসি এবং প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে সেগুলোকে সম্পাদন করি। এর ফলে কোন বোঝাই বোঝা বলে মনে হবে না। বরং নিরানন্দ জীবনের জন্যে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ লাভের কারণ হয়ে যাবে। বস্তুতঃ এটাই বিশেষ কারণ, যার জন্যে জর্মানীর জামাতকে আল্লাহ্‌তা'লা তৌফীক দান করছেন। তাদের অনেকের সাথে যখন দেখা হয় তখন আমি তাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি এবং বলি যে, "আপনাদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভাল রিপোর্ট পেলাম"। তখন তারা বললেন, "কিসের জন্যে শোকরিয়া?! আমরা তা নিজেদেরকে বড়ই আনন্দিত বোধ করেছি। বড়ই ভাল লেগেছে। জীবনের এ গুলো সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ দিন ছিল।" অতএব, মনের আবেগ ঢেলে দিয়ে যে খিদমত পালন করা হয় উহা বিরক্তি ও মসিবত হয়ে দাঁড়ায় না, বরং উহা স্বয়ং পুরস্কার-স্বরূপ হয়ে যায়। এরূপ খিদমতই মানুষকে সেই আত্মতৃপ্তি দান করে যা সেই খিদমতকে স্থিতি-শীল করে যায়। আমি বিশ্বব্যাপী সকল জামাতকে নসিহত করছি যে, এ হিসেবে আগমনকারী তাঁদের মেহমানদের (সেবার) জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন। এই আগন্তুকদের মাঝে এখন সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অতিথিরা হচ্ছেন নবদীক্ষিতগণ। নতুন বয়াতকারীদের ধারা এখন এতো বেড়ে গেছে যে, তাদের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে ব্যাপকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া যায় না। যদি আকস্মিকতা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে এদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক এরূপ লোক থেকে যাবে যাদেরকে দেখার ও খোঁজ-খবর নেয়ার মত কেউ হবে না। অথচ আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে 'তালীফে-কালব' অর্থাৎ ইসলামে নবাগতদের মনোরঞ্জন ও প্রীতি-সঞ্চারের যে আদেশ দান করেছেন—এহেন লোকদেরকে পবিত্র কুরআন 'মুয়াল্লাফাতুল-কুলুব' বলে বর্ণনা করে—তদনুযায়ী এরা হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা প্রারম্ভিক কালে যদি ভালোবাসা পেয়ে যায়, তাহলে চিরকালের জন্যে আপনাদের হয়ে যাবে। যদি সূচনাকালে (প্রাথমিক অবস্থায়) যদি তাদের সাথে অবহেলা ও শীতল ব্যবহার হয়—তাদেরকে আপন করে নেয়, তাদেরকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে নিতে পারে এমন কেউ-ই যদি না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় অসম্ভব কিছু নয় যে, এইসব লোক ধীরে ধীরে স্খলিত হয় হয়তো পেছনে সরে যাবে অথবা নিজেদের 'বে-আমলি' ধরনের (দুর্বল) অবস্থায় ঠাণ্ডা ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। যেমন, লোহা যখন গরম থাকে তখনই উহাকে (ঈপ্সিত) রূপদান করা হয়। যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাহলে সে অবস্থায় উহা রূপ গ্রহণে বঞ্চিত হয়। অতএব, এ সময়টাতেই আপনাদের মেহমানদারীর সদগুণটি যাতে সমষ্টিগত রূপ ধারণে এই নবাগতদের অন্তর জয় করার উপযোগী হয়ে উঠে, সে লক্ষ্যে সুপরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যকীয়। অতএব, সকল জামাতেরই উচিত, সে দিক থেকে এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে বিপুল সংখ্যায় নবাগত মেহমানদের মধ্যে

এমন কেউ না থাকে, যাকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমানস্বরূপ আন্তরিক সেবা-যত্নে সমাদ্রিত না করে। এটা মাত্র অল্প কিছু দিনেরই ব্যাপার। এই মেহমানগণই আবার অল্পকিছু দিনের মধ্যে 'মেযবান' বা অতিথি-সেবকে পরিণত হবে। বয়াতের পর তাদের প্রারম্ভিক জীবনের কয়েক মাস—সর্বাধিক এক বছর-কালীন অভিজ্ঞতায় এরা যদি আপনাদের সদ্ব্যবহারের স্পর্শে প্রভাবিত হয়, আপনারা যদি আন্তরিকতার সাথে তাদের খিদমত করেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে ঐ সব লোকের সৃষ্টি হবে, যারা আপনাদের চেয়েও উত্তম খিদমতকারী (অতিথি-সেবক) হবে। যারা অনাগত কালের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ পূরণে আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্মতৎপর হবে। অতএব, সকল দিক দিয়েই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, আমরা যেন আমাদের অতিথিপরায়ণতার গুণটির ব্যক্তিগত পর্যায়েও উন্নতি সাধন করি এবং সমষ্টিগতভাবেও এরূপ সুসংহত ও সুসংগঠিত করি যে, এর ফলশ্রুতিতে আমরা যাতে আগামী শতাব্দীগুলোতে বিস্তৃত সকল চাহিদা উত্তম উপায়ে পূরণ করতে সক্ষম হই।

এরপর, এখন আমি আপনাদেরকে ঐ (তেলাওয়াতকৃত) আয়াতের উদ্ধৃতি-সূত্রে কিছু কথা বলতে চাই। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন: "কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আন্‌ফুসিহিম লা তাক্‌নাতু মির-রাহ্‌মাতিল্লাহে"—তুমি বলে দাও যে, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না।

"ইন্নাল্লাহা ইয়াগ্‌ফিরুয-যুনূবা জামীয়া"—নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত গোনাহ্ মোচন ও ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখেন, কোন একটি গোনাহ্‌ও যাতে অবশিষ্ট থেকে না যায়। "ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহীম"—নিশ্চয় সে-ই তিনি যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং বার বার দয়াকারী।

এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়-বস্তুটির প্রয়োজন দাঁড়িয়েছে এজন্যে যে, ইদানীং আমি যখন আপনাদেরকে তাকওয়া (খোদা-ভীরুতা)-এর দিকে আহ্বান করি এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পায়রবী ও পদাঙ্কানুসরণ করার নসিহত করতে থাকি এবং সম্পূর্ণ শির্‌কমুক্ত ও পবিত্র হওয়ার সম্পর্কে আপনাদেরকে বিশদ-ভাবে বুঝাতে সচেষ্ট হই, তখন কারও কারও অন্তরে হয়তো অত্যন্ত ভীতির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। বস্তুতঃ কোন কোন ব্যক্তি চাপা ভাষায় আমার কাছে ইহা ব্যক্তও করেছেন যে, যখন নেকী বা পুণ্যের এতো সব দাবী, চাহিদা ও মাত্রা এবং এতো সব চড়াই ও উন্নত স্তরসমূহ বিদ্যমান, যা আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে, তদুপরি কোন কোন অবস্থায় আবার সামান্যতম পদস্খলনও আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে

পারে, বস্তুতঃ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এক শের্‌কপূর্ণ অবস্থার ভেতর নিঃশ্বাস নিচ্ছি এবং অনেক সময় অজ্ঞাতসারে খোদাতা'লার ভালোবাসার মোকাবেলায় দুনিয়ার ভালোবাসাগুলিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং নিজেদের প্রবৃত্তিমূলক বাসনা-কামনাকে দীনের চেয়ে শ্রেয়ঃতর মনে করে অগ্রগণ্য করি, এমতাবস্থায় আমাদের কী হবে? এসব তো হ'ল ঐ সব বিষয়, যা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখে ধরাও পড়ে না, বরং চিহ্নিত করা হলে ওগুলোর কিছু কিছু আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আলোর প্রত্যেক মাত্রা বা স্তরের সাথে দৃষ্টিশক্তির সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিলাভ, মেহনত ও পরিশ্রমকে চায়। আপনারা যদি বাইরে থেকে অন্ধকার কামরায় আসেন, তাহলে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। তারপর ধীরে ধীরে আবছা-আবছা আলোর উদ্ভব হয় এবং উহা ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আলো দেখার আপনার ক্ষমতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রতীয়মান হয় যেন সেই প্রকোষ্ঠ যা অন্ধকার ছিল সেখানে কোথাও থেকে নিংড়িয়ে নিংড়িয়ে আলো আসছে এবং তাতে সেই প্রকোষ্ঠ পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। অতএব, মানুষ যখন মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং পরিশ্রম করে, তখন খোদাতা'লা তার দেখার ক্ষমতাকে আলো দান করেন। তার অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি-শক্তি সমুজ্জল হয়ে উঠে। কোথাও বাইরে থেকে অন্য কোন আলো তখন আসে না। কিন্তু ঐ সব ব্যক্তি, খোদাতা'লা যাদের অন্তর-দৃষ্টি বাড়িয়ে দেন, অতঃপর প্রায়শঃ তাদের জন্যে অধিকতর আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন। সুতরাং উভয় দিক থেকে এই প্রক্রিয়া তাদের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এক তো প্রত্যক্ষ করার শক্তি বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ আসমান থেকে (সহায়ক হিসেবে) নূরও অবতীর্ণ হতে থাকে। বস্তুতঃ কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত দু'টি ধারার কথাই উল্লেখ করেছেন যে, এমনি ধারায় মানুষ ক্রমে ক্রমে নূরের দিকে অগ্রসরমান হয়। বস্তুতঃ ইহজগতে খোদাতা'লার নূরের যদি কোন বিকাশস্থল বা প্রতিচ্ছবি স্বরূপ কেউ থেকে থাকেন, তাহলে তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। এ হিসেবে যখন আমি আপনাদেরকে বলি যে, নূরের দিকে কদম বাড়ান, তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-ই সর্বদা লক্ষীভূত হয়ে থাকেন। কিন্তু (আপাতঃ দৃষ্টিতে) নূরে উপনীত হওয়া তো খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বিষয়-বস্তুটি বুঝিয়ে দেয়াও অপরিহার্য। যখন আমি এ বিষয়টি আপনাদেরকে বিশদভাবে বোঝাবো, হৃদয়ঙ্গম করবো, তখন উহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার আকারে আপনাদের কাছে পরিদৃষ্ট হবে। বাস্তবিক পক্ষে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং উক্ত বিষয়-বস্তুটির উপর স্পষ্টাকারে আলোকপাত করেছেন। এর গুরুত্বও সুস্পষ্ট করেছেন এবং সেই সাথে ইহাও খোলাসা করে দিয়েছেন যে, কোনরূপ নৈরাশ্যের শিকার হওয়া ব্যতিরেকেই আমাদেরকে ক্রমশঃ উন্নতি করতে হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"অত্যন্ত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে সত্যের সন্ধানে বের হয়, তারপর সে সুধারণাকে কাজে লাগায় না, অবলম্বন করে না।"

অর্থাৎ এই নিয়্যত করে বের হয় যে, সে সত্যের সন্ধান করবে এবং তাকে সত্যে পৌঁছুতে হবে, তারপর যদি সে সুধারণাকে অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ না করে তাহলে সে এক দুর্ভাগাই বটে। এখানে "সুধারণা" বলতে কী বুঝায় ? বলেছেন :

"কোন মৃৎশিল্পীকেও তো দেখ যে, মাটি দিয়ে পাত্র বানাতে গিয়ে তাকে কত কিছু করতে হয়।" অর্থাৎ সে যে মাটির পাত্র বা ভাণ্ড তৈরী করছে, আপনারা কখনও তাকে মনোনিবেশে তাকিয়ে দেখুন ! আমি কয়েকবারই দেখেছি। উহা এক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হয়ে থাকে—অত্যন্ত দৃষ্টি-কাড়া দৃশ্য। কীভাবে সে একটা মাটির গোলাকে বিভিন্ন আকৃতিতে ঢালে, অকস্যাৎ ওটাতে ছিদ্র সৃষ্টি করে, নক্‌শা ভরে ও কারুকার্যে সজ্জিত করে। একবার আমরা স্কটল্যাণ্ড সফরে যাই। সেখানে অত্যন্ত দক্ষ মৃৎশিল্পীরা তাদের কাজ করছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে দৃশ্য দেখে সেখান থেকে মন যেতে চাচ্ছিল না। রাবওয়াতে মাটি দিয়ে পাত্র নির্মাণকারী আমাদের একজন ছিলেন। বহুবার বাইসাইকেলে যেতে যেতে সেখানে গিয়ে থেমে যেতাম। অতএব, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সে দৃষ্টান্তটি-ই তুলে ধরেছেন। যা সৌভাগ্যক্রমে আমার অন্তরে পূর্বেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি (আঃ) বলছেন যে, মৃৎশিল্পীকে দেখ। মানুষের অস্তিত্বের সাথেও এ দৃষ্টান্তটির সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ মাটি দিয়ে তৈরী, এবং মাটি দিয়ে মৃৎপাত্র নির্মাণকারী (মৃৎশিল্পী) যে পরিশ্রম করে আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের উপর তার চেয় ঢের বেশী পরিশ্রম করে রেখেছেন। এতদুভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। তিনি হলেন 'খালেকেআযালী' (আদি-অন্ত-চিরন্তন সৃষ্টিকর্তা), তাঁর সাথে মাটি দিয়ে মৃৎপাত্র নির্মাতার কোনও তুলনার লেশ মাত্রও নেই—সেই মহান সৃষ্টি-কর্তা, যিনি আদিকাল থেকে মানব সৃষ্টির নক্‌শা প্রণয়ন করেন এবং মাটিকেই বিভিন্ন রূপে ও রঙে ক্রমোন্নতি দিয়ে জীবনের স্তরসমূহে প্রবিষ্ট করেন। এই বিষয়-বস্তু এতো ব্যাপক ও বিশাল যে, সমগ্র জগদ্ব্যাপী অসংখ্য বিজ্ঞানী এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে উৎসর্গীকৃত হয়ে আছেন, কিন্তু এর মূল রহস্য ও আসল সত্যের নাগাল পান নি এবং তারা স্বীকার করেন যে, এক জায়গায় পৌঁছার পর সম্মুখে যেন একটা শক্ত পর্বত উঁচু হয়ে দাঁড়ায় এবং সামনে যাবার কোন পথ থাকে না। যে গোপন তত্ত্বের তারা সন্ধান পান, কিছু কাল পরই জানা যায় যে, ওটা আসলে কোন গুঢ়তত্ত্ব নয় বরং এরূপ এক গোলক-ধাঁধাঁর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, যা সমধিক অজানা রহস্যাবলী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যেটাকে তারা সমাধান মনে করে বসে ছিলেন, ওটা তো গোলক-ধাঁধাঁ হয়ে গেছে। আমি যে আপনাদেরকে একথাগুলো বলছি, জ্ঞানের ভিত্তিতেই বলছি। আমি ঐ বৈজ্ঞানিক-দেরকে জানি যারা বড় বড় বেশ কিছু তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং অত্যন্ত গর্বের সাথে

ঘোষণা করেছিলেন যে, "এবার আমরা জীবনের সূচনা-রহস্য জেনে বা বুঝে গেছি।" সারা জগদ্ব্যাপী বিজ্ঞানীগণ তাদেরকে খুব ফলাও করে তুলে ধরেন এবং প্রচার করেন যে, এই সেই ব্যক্তির অভ্যুদয় হয়েছে যিনি জীবনের সূচনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছেন। (কিন্তু) দশ কি পনর বছর পর সে বিজ্ঞানীই বলেন যে, "আমরা বড়ই ভুল বুঝে ছিলাম ওটা যা আমরা পূর্বে ঘোষণা করেছিলাম। আসলে আমরা কিছুই জানতে পারি নি। যেটাকে আমরা জীবনের সূচনা-রহস্য ও প্রকৃতস্বরূপ বলে মনে করেছিলাম ওটা তো এরূপ এক গোলক ধাঁধা সাব্যস্ত হয়েছে যা জটিলতার চক্রবালে কেবল বাড়তে থাকে এবং এর রহস্য কিছুই বুঝতে পারি না।"

অতএব, নিখিল বিশ্বের তিনিই সেই খোদা যিনি মাটি থেকে মানুষ বানিয়েছেন এবং মাটি দিয়ে গড়া সেই মানুষ নিজের (উৎপত্তির) রহস্য ও স্বরূপকে বুঝতে পারলো না এবং পারবেও না। সে দেখতে চায়, তাকে কী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু অনেক দেরীতে তার এই চেতনা জেগেছে। আজ সে পেছনে ফিরে দেখতে চায় যে, সাড়ে চার শ' কোটি বছর পূর্বে এই মাটি থেকে তার সৃষ্টির উন্মেষ কী করে ঘটানো হয়েছিল, যদিও কিনা আল্লাহ্‌তা'লা ঐ সময়কার চিহ্নাবলী আজও অবশিষ্ট (ও অক্ষুন্ন) রেখেছেন। সেগুলো মানবীয় ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাসের জায়গায় জায়গায় এমনভাবে ক্ষোদিত করে দেয়া হয়েছে যে, আজও ঐ সব চিহ্নকে পাঠ করা যায় যদি কারও অন্তরদৃষ্টি বিদ্যমান থাকে। অতএব, অন্তরদৃষ্টির (ক্রিয়াশীলতার) সাথে সাথে (উহার) আলো বৃদ্ধি পায়—যেমন কিনা আমি বর্ণনা করে এসেছি। ফলতঃ যে সব চিহ্ন পূর্বে দেখা যাচ্ছিল না, সেগুলোও পরিদৃষ্ট হতে শুরু করে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তারা (তত্ত্বানুসন্ধানের) কোন এক জায়গায় পৌঁছার পর এজন্যে অন্ধ কি অন্ধ হয়েই থেকে যায় যে, তাদের উপর ঐশী আলো অবতীর্ণ হয় না। বস্তুতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশী আলো অবতীর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত (নিছক) মানবীয় সূক্ষ্মদৃষ্টির উন্নতি তাদের কোনও কাজে আসে না। মাত্র কয়েকটি রহস্যই তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু জগৎ-সৃষ্টির গভীরে যে প্রকৃত গুঢ়তত্ত্ব ও মৌলিক সত্য বিদ্যমান রয়েছে তা সম্পূর্ণ তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যেতে যেতেও তারা খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, পারবেও না। এ দিক দিয়ে মুমেনের সূক্ষ্মদৃষ্টি (بصیرت) এবং অ-মুমেনের দৃষ্টির মাঝে একটা পার্থক্য বিদ্যমান। মুমেনের অন্তরদৃষ্টির সাথে ঐশী নূর যোগ হয়। ঐ নূর তাকে (উন্নততর) সেই আলোক দান করে, যা কেবল জাগতিকভাবে পরিশ্রম ও গবেষণা-কারীদের ভাগ্যে জুটে না।

অতএব, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) মৃৎশিল্পীর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এই বলে যে, দেখ, সে কীভাবে মাটির ভাণ্ডসমূহ তৈরী করে। তার 'সুধারণা'র

বিষয়-বস্তু হচ্ছে এই যে, সে (কাদা) মাটির একটা গোলা হাতে ধরে এবং সে এই 'সুধারণা' (আত্মবিশ্বাস) রাখে যে, এটা দিয়ে যা সে তৈরী করতে চায় তা হয়ে যাবে। সে ক্লান্ত হয় না, বিভিন্ন আকার-আকৃতি দিতে থাকে বিরামহীনভাবে এবং দৃঢ়-বিশ্বাস ও প্রত্যয় রাখে যে, যা সে চায়, সেরূপ তা হয়ে যাবে। অতএব, মুমেন, যার (সৃষ্টির) পেছনে খোদাতা'লা কর্তৃক মাটিকে আকৃতি দান এক ইতিহাস রূপে বিদ্যমান রয়েছে, সে (মুমেন) কী করে নিজের (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) রূপদানের ক্ষেত্রে নিরাশ হতে পারে? হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, তোমাদের পক্ষে তা শোভা পায় না। নচেৎ, যে মানব আল্লাহ্‌র সৃজন-কৌশলের শ্রেষ্ঠ অবদান সে দৈনন্দিন যারা ইট বানায় তাদের চাইতেও হেয় প্রতিপন্ন হয়ে পড়বে। বস্তুতঃপক্ষে পরিশ্রম করতে হবে এবং এই সুধারণা রাখতে হবে যে, পরিশ্রম কাজে আসবে। তবেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে উন্নতি করতে পারে। নইলে, সে উন্নতি করতে পারে না। অতএব, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রত্যেক গোনাহগারকে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে যে খোদাতা'লার পথে এগিয়ে যেতে চায়, দেখুন, কত সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাকে প্রবুদ্ধ করছেন। বলছেন, "হুস্‌নে যান্‌" অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয় ও আল্লাহ্‌র সহায়তার প্রতি সুধারণাকে কাজে লাগাও। পরিশ্রম করে যেতে হবে। সময় লাগবে। কোন কোন জিনিস চট করে হাতে আসে না। ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে সুসম্পন্ন হবে। অতএব তিনি বলছেন,

"ধোপার দিকে তাকাও। সে কতো না-পাক এবং ময়লা কাপড়গুলোকে যখন পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে তখন কত কাজ যে তাকে করতে হয়! কখনও ভাটায় তোলে। কখনও সেগুলোকে সাবান দিয়ে ঘসে। কখনও সেগুলোকে ময়লা ও দাগ মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন তদ্বির অবলম্বন করে।"

খোৎবার অবশিষ্টাংশের সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেয়া গেল:

হুযূর (আইঃ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উল্লেখিত উদ্ধৃতির আলোকে বলেন, যে, নিজেদেরকে পাপমুক্ত ও পবিত্র করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। খোদাতা'লার প্রতি সুধারণা রাখুন। তদ্বির ও পরিশ্রমকে কাজে লাগান। এবং যদ্দুর তৌফীক ও সাধ্যে কুলোয় খোদা-ভীরুতা (তাকওয়া) এবং ন্যায়-বিচারের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণপূর্বক নিজের দুর্বলতা-গুলোর মধ্যে প্রথমে কিছু কিছু বেছে নিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত ও দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করুন যে, সেগুলিকে তো অবধারিতভাবে পরিত্যাগ করবেন। অতঃপর "ওয়াস্‌তায়ীনু বিস-সাব্‌রে ওয়াস সালাত" অর্থাৎ ধৈর্য সহকারে সেই 'হুস্‌নে-যান্‌' বা সুধারণার মাধ্যমে যে, এসব দাগ মিটে যাবে, আর এই প্রচেষ্টায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থেকে এবং "ওয়াস্‌-সালাত"-অর্থাৎ ইবাদতের মাধ্যমে,

নামায পড়ে পড়ে খোদাতা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকুন এবং ঐ সব (দুর্বলতার) দাগ (জীবন থেকে) মিটিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়ুন, যা কুৎসিৎ দেখা যায়। যখন আপনারা ঐ দাগগুলিকে দূর করে দিবেন, তখন আবার দেখতে পাবেন যে, ওগুলোর নীচে লুকিয়ে থাকা অন্যান্য আরো কুৎসিৎ দাগও ছিল। সেগুলিকেও আবার দেখতে পাবেন ওগুলিকেও দূর করার প্রক্রিয়া শুরু করুন।

হুযূর বলেন, আপনারা নিজেদেরকে গোনাহ্-মুক্ত করার সফর শুরু করুন এবং আল্লাহ্-তা'লার রহ্মত সম্পর্কে কখনও নিরাশ হবেন না। যদি আল্লাহ্তা'লার রহমত সহায়ক হয়, যদি 'ওয়াস্তায়ীনু বিস্ সাবরে ওয়াস-সালাত" অনুযায়ী আমল (চেষ্টা) অব্যাহত থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সব ধরনের দাগই মিটানো যায়।

উদ্ধৃতিটির শেষাংশে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন:

"যখন সামান্য সামান্য জিনিসের জন্য এত ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হয় তখন কতো নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে তার জীবনের ইসলাহ্ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং অন্তঃকরণের ময়লা ও কলুষতাগুলো দূর করার জন্য এই আকাঙ্খা পোষণ করে যে, এগুলো কোনও (কারো) ফুঁক মারার দ্বারা বেরিয়ে যাবে এবং 'কল্ব' (অন্তঃকরণ) পাক-সাফ হয়ে যাবে।"

হুযূর (আইঃ) বলেন, আহমদীয়্যত আল্লাহ্তা'লার বড়ই এহসানস্বরূপ। বহু প্রকারের অন্ধকার থেকে তিনি এর মাধ্যমে আপনাদের উদ্ধার এবং নিরাপদ করেছেন। কিন্তু—আলোকে পৌঁছার পর সফর সমাপ্ত হয় নি বরং সফরের সূচনা হয়েছে। বস্তুতঃ তৌহীদের সফর অনন্ত, অপরিসীম।

(ধারণকৃত ওডিও ক্যাসেট থেকে অন্দিত ও সংক্ষেপিত)

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

আক্রমণ ছাড়াই আক্রান্ত

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আধুনিক মারণাস্ত্রাদি বিশেষ করে আণবিক বোমা যে কত ধ্বংসাত্মক হতে পারে তা বিশ্ববাসী গত বিশ্ব-যুদ্ধের শেষাংশে প্রত্যক্ষ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ঐ সময়ে দু'টো মাত্র বোমা দ্বারা ধ্বংস করে দেয় হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামক দু'টো শহরকে। এ ধ্বংস ছিলো প্রায় সর্বগ্রাসী। এর তেজস্ক্রিয়া স্বল্প সময়ে আবদ্ধ থাকে নি। এখনও তা চলছে। কত-দিনে তা দাঁড়ি টানবে তা বলা যাচ্ছে না। ইচ্ছাকৃতভাবে বোমা না ফেল্লেও যা ঘটতে পারে এরও একটি উদাহরণ নেয়া যাক। এক যুগের বেশী হল রাশিয়ার পরমাণু-স্থাপনা কেন্দ্র চেরোনোবিলে দুর্ঘটনা ঘটে। এর তেজস্ক্রিয়তার প্রতিকুল প্রতিক্রিয়ায় এখনও মানুষসহ প্রাণীকুল ও পরিবেশ আক্রান্ত হচ্ছে। নিম্নে প্রদত্ত খবরটি মানব-প্রেমিক ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের হৃদয়কে নাড়া না দিয়ে পারে না :

মারাত্মক হুমকির মুখে মার্কিন পরমাণু স্থাপনা

একদল মার্কিন বিশেষজ্ঞ সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও ষ্টোরেজ সেন্টারগুলো ভূমিকম্প, টর্নেডো ও বন্যাসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। —ওয়াশিংটন থেকে সিনহুয়া।

বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলেছেন, সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলোকে নিয়ে। এগুলো থেকে আশপাশের এলাকায় তেজস্ক্রিয় ও বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান নিঃসরণ হতে পারে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ক চেয়ারম্যান মারে বলেছেন, আজ যদি একটা বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়, তবে তা থেকে স্থাপনার আশপাশের এলাকায় তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি দফতরকে দেশের পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপনা ও মজুদ এলাকা কতটুকু বিপজ্জনক তা পর্যবেক্ষণে সহায়তা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত পারমাণবিক স্থানগুলোর জন্য অন্যতম ভয়াবহ বিপদ হচ্ছে ভূমিকম্প। এছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ও বন্যাসহ আরও হুমকিও রয়ে গেছে।

তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থাপনাগুলো সম্ভবতঃ মানুষেরই তৈরি। সোভিয়েত আমলের গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলা করার লক্ষে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্র দু'ডজন পারমাণবিক অস্ত্র কেন্দ্র নির্মাণ করে। কেন্দ্রগুলোর বেশির ভাগই খুব তাড়াহুড়া

করে নির্মাণ করা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব রয়েছে এগুলোতে। কয়েকটি কেন্দ্র যদিও তখন থেকেই বন্ধ রয়েছে, তবুও এখনও সেখানে তেজস্ক্রিয়া উপাদান গুদামজাত করে রাখা আছে। মার্কিন জ্বালানি দফতর যুক্ত-রাষ্ট্রের পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রগুলোর ঝুকির ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করছে। ক্লিনটন প্রশাসনের আগে এ দফতর কখনোই নিয়ম করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিকে নজর দিয়েছে কিনা জানা নেই। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭-৭-৯৬)

এতে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাববার আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারো হাত থাকে না। এজন্য আমরা কোন দেশ বা এলাকাকে ভাগ বা নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না। বন্যা ভূমিকম্প টর্নেডো আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাৎ আমাদের ইচ্ছা ও অনুমতির ধার ধারে না। তা ছাড়া মানুষের ভুল-ভ্রান্তির প্রবণতা কখনও পেছন ছাড়া হবে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ দুর্যোগ দুর্ঘটনা বা ভুল-ভ্রান্তির ফলে যে মারণাস্ত্র শত্রু দেশের জন্য নিবেদিত তাই নিজ দেশের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে একেই বলা যায় 'আক্রমণ ছাড়াই আক্রান্ত'।

আত্ম-রক্ষার্থে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও আল্লাহ্‌র নির্দেশে যুদ্ধ করতে হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ কুরআনে বলেন: 'এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।' (২:১৯১)

যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও যে মানবতাবোধ ও পরিবেশ সচেতনাকে সজীব ও সক্রিয় রাখতে হবে তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুদ্ধকালীন নির্দেশ হতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। যেমন, 'সৎলোকের প্রাণবধ করিও না, শিশু, রোগী ও নারীর উপর অত্যাচার করিও না; লোকের বসতবাটি, খাদ্য সামগ্রী ও ফলবান বৃক্ষ নষ্ট করিও না।' বস্তুতঃ ইসলামের যুদ্ধ যে শুধু আত্ম-রক্ষার জন্য এবং কখনও তা সার্বিক ধ্বংসের জন্য নয় তা উপলব্ধি করা মোটেও কষ্টকর নয়। যুদ্ধে আধুনিক মারণাস্ত্র ব্যবহারে উল্লিখিত নীতিসমূহ অবলম্বন বা কার্যকর করা কখনও সম্ভবপর নয়। আণবিক বোমার কথা ধরা যাক। কোন এলাকায় এ বোমা ছেড়ে দিয়ে কি সৎলোক, শিশু, রোগী, বসতবাটি, খাদ্য-সামগ্রী, ফলবান বৃক্ষ কোন কিছু রক্ষা করা যাবে? না, তা কখনও নয়। বোমা কারো 'বউমা' নয় যে, কারো নিষেধ গ্রাহ্য করবে। তাই দেখা যাচ্ছে আধুনিক যুদ্ধ কখনই ইসলামসম্মত হতে পারে না। ইসলাম এসেছে মানবতাকে সদা সুস্থ ও সজীব রাখতে। কখনও ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য নয়।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যখন আসবেন অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন ইসলামের পুনরুজ্জীবন দান ও পুনর্বাসনের

জন্য আগমন করবেন তখন তিনি যুদ্ধ ও জিজিয়া কর রহিত করবেন। একটু গভীর-ভাবে চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যায় যে, বর্তমান যামানাই সে যামানা। আগেই বলা হয়েছে আধুনিক যুদ্ধ ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মানবতাকে রক্ষা করতে ও বিশ্ববিপর্যয়কে এড়াতে হলে এ ধরনের যুদ্ধ রহিত করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যে নবী [হযরত ঈসা (আঃ)] এক গালে চড় দিলে অন্য গাল পেতে দিতে বলেছেন তাঁর উম্মতের দাবীদারেরাই সামগ্রিক ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রের প্রধান ধারক ও বাহক। আশা ও আনন্দের কথা যে, হযরত মসীহ নাসেরী (আঃ) দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র যুদ্ধ রহিতকে কার্যকর রূপ দিতে যাচ্ছেন। এর আভাসও ক্রমাগত স্পষ্টতর হয়ে চলেছে। গত দু'টো বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তীতে 'লীগ অব নেশানস্' ও জাতিসংঘ কায়েমের দ্বারা যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস ও অকল্যাণ এবং শান্তির অপরিহার্যতা মানুষের মন-মানসিকতায় জোর দানা বেঁধেছে। এটাকে অগ্রগামী ধারা বলা যায়। বিশ্ব-আদালত, অলিম্পিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অখণ্ড মানবতাবোধের পরিপূরকরূপে কাজ করছে। আণবিক শক্তিধরেরাই তৎপরতা চালাচ্ছে বিশ্বে আণবিক শক্তির প্রসার রোধ করতে। দুঃখের বিষয় যে, তারা তাদের মজুদ অস্ত্র ধ্বংস করতে রাজি হচ্ছে না। অর্থাৎ তারা তাদের হীন স্বার্থের উর্দ্ধে ওঠতে পারছে না। এ হলো পশ্চাৎমুখী ধারা যাতে রুগ্ন মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটে। আমাদের জামাতকে অগ্রগামি ধারাকে জোরদার এবং পশ্চাৎমুখী ধারাকে মুছে ফেলার মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। এজন্য জাতি ধর্ম বর্ণ ও দেশের সীমানা অতিক্রম করে ঘরে ঘরে প্রকৃত ইসলামের শান্তির মহান বাণী পৌঁছাতে হবে। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃবন্ধনকে ব্যাপক ও দৃঢ়মূল করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেছেন। তিনি অতি দৃঢ়তার সাথে নবী করীম (সাঃ)-এর যুদ্ধ ও জিজিয়া কর রহিতের নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলেছেন। তিনি ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তারক্তির যুদ্ধকে রহিত ঘোষণা করেছেন। আত্মশুদ্ধি ও ইসলাম প্রচারের জেহাদকে [জেহাদে কবীর] সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। খেলাফতের মারফত সুসংগঠিতভাবে বিশ্বময় এই কার্যক্রমকে ক্রমাগত জোরদার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৫২টি দেশে প্রচার মিশন কায়েম করা হয়েছে। অর্ধশতাধিক ভাষায় পাক কুরআনের তর্জমা প্রকাশ করে বিলি ও বিক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ জাতি ও ধর্মের লোক ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেছেন। আল্লাহ্‌র হাজার শোকর যে, এই বৎসর ১৬ লাখ ৬ হাজার নারী-পুরুষ বয়াত গ্রহণ করেছেন। এই জামাতের সদস্যরা তাদের জান মাল সময় সম্মান সবকিছু কুরবান করে প্রকৃত মুমেনের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাদের সাফল্য বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপন করবে। বিশ্ববাসী তখন যুদ্ধের রাহু হতে মুক্তি পাবে। মারণাস্ত্রের দিন ফুরাবে। এ খাতে বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াবে। বিধ্বংসীকর এই খাতের অর্থ মানবকল্যাণের পথকেই শুধু প্রশস্ত করবে না 'আক্রমণ ছাড়াই আক্রান্ত' হওয়ার পথও আপছেই রুদ্ধ হয়ে যাবে। সেই সুদিনকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা বিশ্ববাসীকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ডাকে সাড়া দিতে হৃদয়ের অন্তস্থল হতে আহ্বান জানাচ্ছি।

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দৈনন্দিন জামাতি কার্যক্রমের সময়সূচী ও কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হল। প্রয়োজনে এই সময়সূচী বর্দ্ধিত করা যাবে:

১। স্থান: মোহাম্মদপুর, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা—জামাতি ফাইল পত্র দেখা, সিদ্ধান্ত প্রদান, জরুরী সাক্ষাৎ প্রদান, আহমদী পত্রিকার জন্য রচনা এবং বিরুদ্ধবাদীদের লিখিত জবাব প্রদান ও অন্যান্য কর্ম।

২। স্থান: দারুত তবলীগ, বাদ আসর থেকে এশা পর্যন্ত--নিয়মিত জামাতি কার্য পরিচালনা। কোন সপ্তাহিক ছুটি থাকবে না। মাসের প্রথম দশকে দুই দিন ব্যক্তিগত কাজের জন্য ছুটি ভোগ করবেন।

সকলের অবগতির জন্য প্রচারিত।

(৩২ পাতার অবশিষ্টাংশ)

"এ কবরস্থানে যারা সমাধিস্থ হবেন, তাঁরা হবেন মুত্তাকী, সর্বপ্রকার হারাম থেকে আত্মরক্ষাকারী, কোন প্রকার শির্‌ক ও বেদা'তের কার্য করবেন না এবং খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হবেন।" (পৃঃ-৩৭-৩৮)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ পুস্তিকায় লিখেন:

"এই কাজে অগ্রবর্তীগণ সাধু পুরুষগণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন এবং খোদাতা'লার রহমত তাঁদের উপর চিরকাল বিরাজমান থাকবে। (পৃঃ-৫০)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্‌ ওসীয়ত পুস্তিকায় বর্ণিত ব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেক সালেহ ব্যক্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল বর্ষণের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। সুতারাং প্রত্যেক আহমদী—তিনি পুরুষই হোন আর মহিলাই হোন—তাকে এ মর্যাদার অংশীদার হওয়ার প্রয়োজন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) ওসীয়াতকারীগণকে তাঁদের নিজ নিজ জামা'তে তা'লীমুল কুরআনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তাছাড়া একজন ওসীয়্যতকারী আর্থিক কুরবানীর দিকেও শীর্ষস্থানীয় হবেন—এটাই যুগ-ইমামের প্রত্যাশা। তাই আসুন আমরা যুগ-ইমামের ইচ্ছাকে পূরণ করতে সচেষ্ট হই। প্রত্যেক ওসীয়্যতকারী জামাতের বিভিন্ন কাজে ও হযরত খলীফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর সকল তাহরীকে অংশ নিয়ে বিশেষ মর্যাদা ও দায়িত্বের অংশীদার হই।

আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(বিংশ কিস্তি)

লা নাবীয়্যা বা'দী-প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন

যদি কেউ বলে যে, এ কথাটির মধ্যে 'লা' নফী জিনস্ (না-বোধক) আর 'নবী' শব্দটি সাধারণ। এ কারণে এ হাদীসের আলোকে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে সাধারণ নবী আসা না-বোধক হয়ে যায়। তাহলে পরে কেন এ হাদীস দ্বারা হযরত ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী প্রমুখ আলেমগণের ন্যায় শরীয়তি নবী না-বোধক অর্থে নেয়া হবে ?

উত্তর : এর উত্তর এই যে, ফেকাহ্ শাস্ত্রের উসুল বা নিয়ম অনুযায়ী কোন কোন স্থানে বাহ্যিকভাবে শব্দের তাৎপর্য সাধারণ হয়ে থাকে ; কিন্তু অর্থের দিক থেকে উহার বিশেষ তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়। ফেকাহ্র উসুলের পরিভাষায় এরূপ শব্দকে সাধারণের জন্যে বিশিষ্টার্থক বা ব্যক্তি বিশেষের জন্যে বিশিষ্টার্থক নির্ধারণ করে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে ইহা জরুরী যেন এর পেছনে বিশিষ্টতাদানকারী কোন সুস্পষ্ট কুরআনী আয়াতের নির্দেশ বিদ্যমান থাকে। যেহেতু মুহাক্কেক আলেমগণের দৃষ্টিতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব আল্লাহ্র নবীর মর্যাদায় হওয়া এবং এক রঙ্গে তার আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের 'উম্মতী'ও হওয়া নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহের সুস্পষ্ট নির্দেশের আলোকে সত্যায়িত ও স্বীকৃত বিষয়, এজন্যে নবী করীম (সাঃ)-এর এ হাদীস—'লা নাবীয়্যা বা'দী' এর মধ্যে নবীর সাধারণ তাৎপর্যকে বিশিষ্টার্থক বলে নির্ধারণ করা হয় এবং 'লা নাবীয়্যা বা'দী'—এর মধ্যে নবীর অর্থ করা হয় 'শরীয়তি নবী'। কেননা, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবকে উম্মতী নবীর মর্যাদা হিসেবে স্বীকার করা হয় শরীয়তি নবী হিসেবে স্বীকার করা হয় না। এ দিক থেকে ইহা বুঝা উচিত যে, 'লা নাবীয়্যা বা'দী'—এর 'লা' নফী জিনস্ (না-বোধক), নফী কামাল (পরিপূর্ণ না-বোধক) এর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে নবীর সত্তাকে না-বোধক করার জন্যে ব্যবহৃত হয় নি।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্যে নবীর সত্তার আবির্ভাব হওয়া তো নবী করীম (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট হাদীসের নির্দেশের আলোকে স্বীকৃত। এই হাদীসে 'লা নাবীয়্যা বা'দী'-এর 'লা' নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস—'লা হিজরাতা বা'দাল ফাত্হে'-এর মত। এই হাদীসে মক্কা বিজয়ের পরে সাধারণ হিজরত না-বোধক করা হয়নি বরং মক্কা থেকে মদীনায় বিশেষ হিজরতকে না-বোধক করা হয়েছে।

এ হাদীস উপস্থাপন করে তফসীরে কবীরে লেখা আছে—'ফাল মুরায়াদাল হিজরাতুল্ মাখসূসাতু'-(দেখুন তফসীরে কবীর লির্ রাযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮০ মিসরী ছাপা) অর্থাৎ এতদ্বারা বিশেষ হিজরতকে বুঝান হয়েছে—অনুবাদক। যদিও হিজরতের বাহ্যিক শব্দ সাধারণ এবং এর পূর্বে 'লা' নফী জিনস্-এরও উল্লেখ রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর হাদীস—'ইযা হালাকা কিস্রা ফালা কিস্রা বা'দাহ্ ওয়া ইযা হালাকা কায়সারু ফালা কায়সারা বা'দাহ্'—অর্থাৎ যখন ফিস্রা (পারশ্যরাজ) ধ্বংস হলো তখন তার পরে কোন কিস্রা থাকলো না এবং যখন কায়সার (রোমসম্রাট) ধ্বংস হলো তখন তার পরে কোন কায়সার থাকলো না—অনুবাদক। (সহী বুখারী কিতাবুল ঈমান ওয়ান্ নুযূর)। এর মধ্যেও 'লা' নফী কামাল এর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, কায়সার ও কিস্রা এর পরেও তাদের পুত্ররাও কায়সার ও কিস্রা হয়েছেন কিন্তু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ কথা বলার উদ্দেশ্য ইহা ছিলো যে, তাঁর (সাঃ) যুগে যে কায়সার ও কিস্রা যেমন প্রতাপশালী কায়সার ও কিস্রা ছিলেন এমন আর ভবিষ্যতে হবে না। এভাবে 'লা লাবীয়্যা বা'দী'—এর তাৎপর্য এই যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালাম যেরূপ পরিপূর্ণ নবী, যেরূপ শরীয়তধারী নবী বা স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী এমন কোন নবী আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে হবে না। কেননা, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শরীয়তধারী ও স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী।

'লাম ইয়াবকা মিনান্ নুবুওয়্যাতি ইল্লাল মুবাশ্শিরাতু'—[অর্থাৎ আল্ মুবাশ্শিরাত (শুভ সংবাদ) ব্যতিরেকে নবুওয়তের কোন কিছু অবশিষ্ট নেই—অনুবাদ) হাদীসে নবীর তাৎপর্যও ইহাই যে, নবুওয়তের মধ্য থেকে আল্ মুবাশ্শিরাত ব্যতিরেকে কোন কিছু অবশিষ্ট নেই। এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়তের সবটুকুই বন্ধ হয়ে যায় নি বরং নবুওয়তের একটি অংশ, যা হচ্ছে আল্ মুবাশ্শিরাত তা অবশিষ্ট আছে। আর ইহা সুস্পষ্ট যে, মসীহ্ মাওউদকে উম্মতের মধ্যে 'নবীউল্লাহ্' ঐ আল্ মুবাশ্শিরাতের কারণে আখ্যায়িত করা যেতে পারে যা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তীতার অধীনে লাভ হয়। উহাকে শরীয়তি বা স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী আখ্যায়িত করা যেতে পারে না। কেননা, এরূপ নবুওয়ত 'লাম ইয়াবকা' নিষেধাজ্ঞার অধীনে এসে বন্ধ হয়ে গেছে।

এ হাদীসের ধারাবাহিকতা 'লাম ইয়াব্কা মিনাল মালি ইল্লাদ্দারাহিম' অথবা 'লাম ইয়াব্কা মিনাত্ত্বা 'আমি ইল্লাল খুব্য'-এর ন্যায় অর্থাৎ ধন-সম্পদের মধ্যে দিরহামগুলো ব্যতিরেক কিছু বাকী নেই বা খাবারের মধ্যে রুটি ব্যতিরেকে কিছু অবশিষ্ট নেই। ইহা সুস্পষ্ট যে, দিরহাম ও রুটি যথাক্রমে ধন-সম্পদ ও খাবারের অংশ বিশেষ। এভাবে 'আল্ মুবাশ্শিরাত' পরিপূর্ণতার দিক থেকে হলে তো নবুওয়তও থাকলো আর নবুওয়তের অংশও।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিপূর্ণতার দিক থেকে 'আল্ মুবাশ্শিরাত' লাভ হওয়ার কারণেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে 'নবী' নাম দেয়া হতে পারে।

ইহা সুস্পষ্ট যে, 'আল্ মুবাশ্শিরাত'-ই নবুওয়তের নিজস্ব অংশ। শরীয়ত নিয়ে আসা নবুওয়তের নিজস্ব অংশ নয় বরং সাময়িকভাবে প্রাপ্ত অংশ। এজন্যে কতক নবীর নতুন শরীয়ত লাভ হয়েছে এবং কতিপয় নবী পূর্বের শরীয়তের অধীনস্থ ছিলেন আর জাতির মধ্যে ঐ শরীয়তের মাধ্যমে আদেশ দিতেন। আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ

انا انزلنا التورٰة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا
للذين هادوا - (مائدة ركوع ٧)

বঙ্গানুবাদ ঃ নিশ্চয় আমরা তওরাত নাযেল করেছিলাম—উহাতে হেদায়াত ও নূর ছিলো, এতদ্বারা নবীগণ যারা আত্মসমর্পণকারী ছিলো ইহুদীদের জন্যে ফয়সালা করতো।

(সূরা মায়েদা ঃ ৪৫ আয়াত)

শেখুল আকবর হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) লিখেন ঃ

علمنا ان التشريع امر عارض بكون عيسى عليه السلام ينزل فينا حكما
من غير تشريع و هو نبى بلا شك" - فتوحات مكيه جلد اول ص ۵۷۰)

বঙ্গানুবাদ ঃ আমরা জেনে নিয়েছি যে, শরীয়ত নিয়ে আসা সাময়িক বিষয় অর্থাৎ নবুওয়তের নিজস্ব অংশ নয়। এ কারণে যে, ঈসা (আঃ) আমাদের মধ্যে মীমাংসাকারী রূপে নতুন শরীয়ত ব্যতিরেকে অবতীর্ণ হবেন আর নিঃসন্দেহে তিনি নবীও হবেন।

(ফতুহাতে মক্কীয়া ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭০)

অতএব নবুওয়তের নিজস্ব অংশ হিসেবে 'আল্ মুবাশ্শিরাত'ই নির্ধারিত হয় যা বিরুদ্ধবাদীদের নিকট সতর্কবাণীর তাৎপর্য বহন করে থাকে, আর রসূলদের এ মর্যাদাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'রাসূলাম্ মুবাশ্শিরীনা ও মুনযিরীনা' অর্থাৎ রসূল শুভ সংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী ছিলেন। অতএব মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে নিঃসন্দেহে শরীয়তবিহীন নবীও মান্য করা যায় এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতীও এবং জ্ঞানীদের জন্যে ন্যায়-বিচারক ও মীমংসাকারীও।

ইহা সুস্পষ্ট যে, হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতিবিম্বাকারে আবির্ভাব মান্যকারী মূলতঃ আবির্ভাবের মান্যকারী নন। যেভাবে 'ওফাতে মসীহ্' প্রবন্ধে হযরত শেখুল আকবর (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যে, শেষ যুগে তার অবতরণ অন্য কোন দেহ নিয়ে জরুরী। আর তিনি নবুওয়তের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন ঃ

"وليست النبوة بامر زائد على الاخبار الغيبى"-
(فتوحات مكية جلد ٢ ص ٤١٧)

বঙ্গানুবাদ ঃ খোদা থেকে অদৃশ্যের খবর লাভ করা ব্যতিরেকে নবুওয়ত আর অধিক কোন বিষয় নয়। (ফত্হাতে মক্কীয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৭)

নিঃসন্দেহে কুরআন শরীফ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছে যে, নবীর জন্যে অদৃশ্যের সংবাদ অধিক পরিমাণে লাভ করা শর্ত। যেমন আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول - (الجن : ٢٧-٢٨)

বঙ্গানুবাদ ঃ তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কারও ওপরে অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন,

কিন্তু এমন রসূল ব্যতিরেকে, যাকে তিনি মনোনীত করেন। (সূরা জিন্ন ঃ ২৭-২৮ আয়াত)

মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিও এ কথায় সায় দেয় যে, প্রচুর পরিমাণে ঐশী কথোপকথন সম্বলিত অদৃশ্যের বিষয়াবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ব্যতিরেকে 'নবী' খেতাব লাভ হতে পারে না। একটি দু'টি টাকা থাকলে কেউ যেভাবে ধনী আখ্যায়িত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কাছে এত পরিমাণ সম্পদ হয় যে, সে 'সাহেবে নেসাব' বলে গণ্য হয়।

টীকা ঃ যদি কেউ বলে যে, 'লা নাবীয়্যা বা'দী' হাদীসের আলোকে আগামীতে কোন নবী আসতে পারে না কিন্তু পূর্ববর্তী নবী অর্থাৎ ঈসা (আঃ) উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আসতে পারেন তাহলে জানা আবশ্যক যে,

(ক) এতদ্বারাও 'লা নবীয়্যা বা'দী' হাদীসের সাধারণ তাৎপর্যকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হবে এবং কিঞ্চিৎ অপব্যাখ্যা করা হবে। সাধারণ তাৎপর্যের দৃষ্টিতে কোন পূর্ববর্তী নবী আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে আসতে পারে না। আর পরেও কোন নবী প্রকাশিত হতে পারে না।

(খ) যদি তর্কের খাতিরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মূলতঃ দ্বিতীয়বার আগমন মেনে নেয়া হয় তাহলে ইহা স্বীকার করতে হবে যে, তিনি স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী হিসেবে আবির্ভূত হবেন না বা এসে ইঞ্জিলের প্রতি লোকদের দাওয়াত দিবেন না বরং উম্মতী নবী হিসেবে আসবেন এবং কুরআন করীমের প্রতি আহ্বান করবেন। আর তার নবুওয়তে এ পরিবর্তন একটি নতুন প্রকারের নবুওয়তের জন্ম দিবে। কেননা, প্রত্যেক পরিবর্তন নতুনকে জন্ম দিয়ে থাকে। আর যদি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে নতুন এক প্রকারের নবুওয়তের জন্ম হতে পারে তাহলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে নতুন নবী কেন হতে পারে না? জামাতে আহমদীয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এসব হাদীসের ভিত্তিতে—'ওয়া ইমামুকুম মিকুনম' (সহী বুখারী) এবং 'ফা আম্মাকুম মিনকুম'—(সহী মুসলিম) আগমনকারী ইবনে মরিয়মকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে জন্ম গ্রহণকারী উম্মতের ইমাম জ্ঞান করে। কেননা, আয়াতে ইস্তেখলাফের (সূরা নূর ঃ ৫৬ আয়াত)

আলোকে যেভাবে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর কোন সদৃশ্য তো আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খলীফা হতে পারেন অথচ স্বয়ং ঈসা (আঃ) উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খলীফা হতে পারেন না। অতএব হাদীসসমূহে ইবনে মরিয়মের অবতীর্ণ হওয়া তাঁর বরূয বা প্রতিবিম্বের প্রকাশের জন্যে রূপকভাবে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

যদি কোন ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে নতুন নবুওয়তের জন্মকে স্বীকার না করে আর তাঁর নিজস্ব পূর্ববর্তী নবুওয়তের সাথে যা ছিলো, স্বাধীন-স্বতন্ত্র উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আসাকে স্বীকার করে তাহলে পরে তো হযরত ঈসা সাধারণ নবী হিসেবে খাতামান্নাবীঈন নির্ধারিত হয়ে যান অথচ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামই 'খাতামান্নাবীঈন' নামে অভিহিত। আর এর অর্থ হলো নবীদের সৃষ্টিকারী সত্তা,—শেষ শরীয়তধারী নবী হওয়াও আবশ্যক।

জরুরী টীকাঃ 'খাতামান্নাবীঈন নামে আখ্যায়িত হওয়া এবং 'লা নাবীয়্যা বা'দী' হাদীসে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ তাৎপর্য সর্বদা উহা পূর্ণ হওয়ার পরেই প্রকাশ পায়। ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের ব্যাপারে কারও গবেষণা দলিল বলে নির্ধারিত হতে পারে না। উহা এক ব্যক্তির নিজস্ব মতবাদ বলে মর্যাদা লাভ করতে পারে যা অন্যের ওপরে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। এ কারণে ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য প্রসঙ্গে ইজমা' (সর্বাদীসম্মত মত)-এর দাবীও করা যেতে পারে না এমন কি সব লোক ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্যের ওপরে ঐকমত্য হোক না কেন। কেননা, অদৃশ্যের বিষয়াবলীতে ব্যাখ্যার কোন স্থান নেই আর ইহা হানাফী ফেকাহ্ কর্তৃক স্বীকৃত। যেমন, উসূলে ফেকাহ্ কর্তৃক এর পুস্তক 'মুসাল্লামুস্ সাবূত'-এর মধ্যে লেখা আছেঃ

"اما في المستقبلات كأشراط الساعة وامور الآخرة فلا (اجماع) عند الحنفية
لان الغيب لا مدخل فيه للاجتهاد" – (مسلم الثبوت مع شرح ص ٢٤٦)

বঙ্গানুবাদঃ ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন বিষয়াবলীতে যেমন, কেয়ামতের চিহ্নাবলী হানাফীদের মতে ইজমা' হতে পারে না। কেননা, অদৃশ্যের বিষয়াবলীতে ব্যাখ্যার কোন স্থান নেই। (মুসাল্লামুস্ সাবূত ব্যাখ্যাসহ পৃষ্ঠা ২৪৬)

যেহেতু মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হয়েছে এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর দাবী যে, তিনি মসীহ মাওউদ এবং এক হিসেবে 'নবী' এবং এক হিসেবে 'উম্মতী' এজন্যে ঘটনাবলীর সাক্ষ্য এই যে, উম্মতী নবীর আবির্ভাবে 'খাতামান্নাবীঈন' আয়াত এবং 'লা নাবীয়্যা বা'দী' হাদীস প্রতিবন্ধক নয় যেভাবে কতক কুরআনের আয়াত এবং নবী (সাঃ)-এর কতক হাদীসও ইহাকে বিরোধপূর্ণ সাব্যস্ত করে না যার আলোচনা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে। (চলবে)

ওসীয়্যত বিভাগ থেকে :

ওসীয়্যতকারীর মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য

মর্যাদার লড়াই মানুষের চিরন্তন। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন হাদীসে বলেন, আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করি, আর যাকে ইচ্ছা অপদস্থ বা অমর্যাদাশীল করি। তবে আল্লাহ্র রাহে চলে যে মানুষের মর্যাদা লাভ হয়—সেটি স্থায়ী। শুধু স্থায়ী বললে ঠিক হবে না; কেননা, তা চিরস্থায়ী হবে বলে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন। তাঁর সুন্নতের কোন পরিবর্তন হয় না।

মুহাম্মদী মসীহ আলায়হিস সালাম আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর অনুসারীদেরকে মর্যাদা প্রদানের জন্য তার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সম্পর্কে যে কথা তাঁর রচিত পুস্তিকায় লিখে গেছেন তা আমরা পাঠকদের খেদমতে তুলে ধরছি। আমাদের কাজ সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান কর, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করা :

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হিস্ সালাম 'আল ওসীয়্যত পুস্তিকায় লিখেছেন :

"আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং এর নাম 'বেহেশ্তী মকবেরা' রাখা হয়েছে, এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে, এটি জামা'তের সে সমুদয় ব্যক্তিগণের সমাধি-ক্ষেত্র, যাঁরা বেহশ্তী।" (পৃঃ-৩২) এজন্য আমি আমার বাগানের নিকটবর্তী নিজস্ব মালিকাধীন জমি, যার মূল্য হাজার টাকার কম হবে না, এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছি খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং এটিকেই বেহেশ্তী মকবেরাতে পরিণত করেন। জামা'তের সে সব পবিত্র আত্মা ব্যক্তিগণের যেন এটি তাঁদের নিদ্রাস্থান হয় যাঁরা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন ও সংসার-প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মধ্যে এক নেক পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্য নিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।" (পৃঃ-৩২)

ভেবে দেখুন, একজন ওসীয়্যতকারী কেমন মর্যাদাশীল ব্যক্তি হবেন। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ (আঃ) তৃতীয়বার দোয়া করে বলেছেন 'যাঁদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাঁদের সম্বন্ধে তুমি জান যে, তারা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হয়ে গেছেন এবং তোমার প্রেরিতজনের সহিত বিশ্বস্ততাপূর্ণ নিষ্ঠাচার ও অকপট বিশ্বাস সহকারে প্রেম ও মরণপণ সম্পর্ক রাখেন। আমীন, ইয়ারাব্বাল আলামীন।' (পৃঃ-৩৪)

(অবশিষ্টাংশ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আখেরী কারবালা

মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

হায় হায়, কী অসহায় আজ আহমদের (সাঃ) দীন,
বন্ধু-সুহৃদ আপনজন আজ নাইরে কেহ তার
সবাই মগ্ন আপন-কাজে, দীন-দরদী দীনের কাজে
কেহই নাই আর।

লাখে লাখে ভেসে চল্‌ছে, দুর্বিপাকের ফাঁকে ফাঁকে,
আফসোস ! এ সাবধান-বাণী ও হুশিয়ারী
শুনিবারে লোক যে কেহই নাই।

হে ধনবান ! ধনের নেশায়, দীনের প্রতি অবহেলায়,
দীনের ডিঙ্গা ডুবু ডুবু সবাই খাচ্ছি হাবুডুবু
'বাদাম উড়াও—পাল টাংগাও' বলার মাঝি নাই।
হায় আফসোস ! হাল ধরিবার আজ যে কেহই নাই।
দীনের ঘরে লাগছে আগুন, তাড়াতাড়ি জেগে উঠুন,
'আগুন নিভাও'—এ আহ্বানে, সাড়া দিতে মনে-প্রাণে
নিখিল ধরায় আজ যে কেহই নাই !

মুসলমান ভাই ! খোদার ওয়াস্তে, ধর্মের দুর্দ্দশাতে,
মেহেরবাণীর একটু নযর চাই,
তা না পেলে, প্রাণের ব্যথায়, মরব ভীষণ আকুলতায়
কোথায় আমি কার বা কাছে যাই।

দীনের তরে দুঃখ-দরদীর হায়রে সাথী নাই।
দীনের দুঃখে কাতর বান্দা, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না,
হলাহলের তীব্র জ্বালায়, পরাণ আমার বের হয়ে যায়,
আমার জ্বালার খবর রাখার
অন্য কেহই নাই।

আপন জনের মৃত্যু হলে, মানুষ কাঁদে, হয় পেরেশান,
আজ বেচারা 'দীন' একেলা ; কাঁদছে কারো প্রাণ ?
আজও দেখি এ চোখ দিয়া, কারবালার ঐ খুন-দরিয়া,
শহীদানের স্মৃতির পথে দু'চার ফোটা অশ্রু দিতে,
আজ আর কেহই নাই।

চারিদিকে লক্ষ কাফের এজিদ-সেনা আসছে প্রায়,
ইসলাম—'জয়নাল আবেদীন', একাই খাড়া আছে কারবালায়।

অনুবাদক : চৌধুরী আব্দুল মতীন

মেহমাননেওয়াযী

অধ্যাপক রাজিব উদ্দীন আহমদ

তবলীগের মূল কথা আল্লাহ্‌তা'লা থেকে সমাগত নবীর মাধ্যমে ভুলপথে উপবিষ্ট মানবজাতিকে ন্যায় ও সত্যের আদর্শ পথে পরিচালিত করা। অর্থাৎ অন্যায়, অশান্তি ও ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত মানবজাতিকে প্রকৃত জীবন এবং আল্লাহ্‌তা'লার অফুরন্ত নেয়ামত ও আশীষমণ্ডিত পথের দিকে আহ্বান করা। রুগ্ন মানবজাতিকে রূহানী খাদ্য বিতরণের নামই তবলীগ।

তবলীগের পরই আসে মেহমাননেওয়াজী। রূহানী খাদ্য গ্রহণের জন্য মানুষের চিরকাল তৃষ্ণা রয়েছে। আল্লাহ্‌র নেয়ামত লাভের জন্য দূরদূরান্ত থেকে মেহমানের আগমন ঘটে থাকে। যেমন মক্কায় ঘটেছিল দূরবর্তী আরব গোত্রসমূহ থেকে মেহমানদের আগমন, কাদিয়ানে ঘটেছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা থেকে মেহমানদের আগমন। আগমন-কারীদের উপযুক্ত সেবা ও পরিচর্যার নাম মেহমাননেওয়াজী। এতে পুণ্যের গভীরতা রয়েছে। এর সুফল বহুদূর বিস্তীর্ণ।

মেহমান নেওয়াজীর গুরুত্ব—মেহমাননেওয়াজী মনের সংকীর্ণতা, কুটিলতা, আত্ম-স্তরিতা এবং আর্থিক খরচের ভীতি দূর করে। মেহমান ও মেযবানের মধ্যে সম্পর্ক মধুর করে। সমাজে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ্‌র প্রেম হৃদয়ে প্রোথিত হয়। ويطعمون الطعام على حبه অর্থাৎ তারা তাঁরই প্রেমে আহার করায়।

চতুষ্পদ জন্তু যেমন শুধু নিজেরা আহার করে ; মেহমাননেওয়াজীর ফলে এই স্তর থেকে মানবীয় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। মানুষ কাফেরের স্তর ভেদ করে বিশ্বাসীর স্তরে উত্তীর্ণ হয়। والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام (৪৭:১৩)

অর্থাৎ যারা অস্বীকারকারী এবং তারা (পার্থিব) সুখ ভোগ করে এবং এরূপেই আহার করে বেড়ায় যেমন চতুষ্পদ জন্তু আহার করে বেড়ায়,

মেহমাননেওয়াজীর মাধ্যমে পরস্পরের হৃদয়ে আকর্ষণ, মহব্বতের বিনিময় ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। মেহমানের সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। প্রমাণ-স্বরূপ আল্লাহ্‌তা'লা বিভিন্নভাবে তাদের রিযিক ও উন্নতির রাস্তা প্রশস্ত করে দেন। তাঁর কৃপায় মানুষ সফলতা ও আশীষ লাভ করে সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন।

বর্তমান যামানায় মেহমাননেওয়াজী ঃ

বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বে রজ্জু খেলাফতের পবিত্র ধারা ভেঙ্গে পড়ায় মুসলমানদের জাতীয় জীবনের গতিধারা স্তব্ধ হয়ে গেছে। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের সুন্দর চাঁদর খানাকে ইঁদুর কেটে

টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলেছে। সেবা ও ত্যাগের ভূমিকা পরিহার করে নানাভাবে সেবা পাবার মানসিক বিকার সৃষ্ট হয়ে গড়ে উঠেছে পীরের আস্তানা। মৌলভী পূজা ও পীর পূজা আজ মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। বর্তমান জামানায় প্রাচীনকালের লোকদের মেহমানেওয়াজীর নিদর্শন অতিথিশালা পান্থশালা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমান যামানায় মানুষের সকল চিন্তা-ভাবনা বস্তুবাদিতাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ পশুর স্তর হতে উর্ধ্বে উঠতে পারছে না।

আল্লাহ্‌র প্রেমিক ও মানবদরদী নবী-রসূলগণের দৃষ্টান্ত :

যুগে যুগে আল্লাহ্‌র প্রেমিক ও মানবদরদী নবী-রসূলগণের দু'টি কাজ প্রিয় ছিল—

একটি—রূহানী খাদ্য বিতরণ তথা তবলীগ করা।

অপরটি—দৈহিক খাদ্য বিতরণ অর্থাৎ মেহমানেওয়াজী করা।

ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মেহমানেওয়াজীর দৃষ্টান্ত এবং স্বীয় পুত্র বধূর মধ্যে এ গুণ না পাওয়ায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ :

পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মেহমানেওয়াজীর কথা বর্ণিত হয়েছে :

هل اتك حديث ضيف ابراهيم المكرمين

"তোমার নিকট কি ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মেহমানের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? (৫১:২৫)

فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين

এবং সে নীরবে নিজ পরিবারের নিকট চলে গেল এবং একটি মোটা তাজা গো-বৎস নিয়ে আসল।

হাদীসে বর্ণিত আছে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) বহুদিন পর তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মক্কায় আসেন। ইসমাঈল গৃহে ছিলেন না। পুত্র বধূ এই বুযুর্গের কোন আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে না বরং তাদের অবস্থার শোচনীয় দিকের এক ফিরিস্তি তুলে ধরে। এতে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং যাবার সময় 'ইসমাঈল যেন দরজার চৌকাঠ বদলায়।'—এ কথা বলে যান।

হযরত লূত (আঃ)-এর মেহমান :

পবিত্র কুরআনে হযরত লূত (আঃ)-এর মেহমানেওয়াজীর উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে—قال ان هؤلاء ضيفى তিনি বললেন নিশ্চয় ইহারা আমার মেহমান।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মেহমানেওয়াজীর দৃষ্টান্ত :

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিভিন্নভাবে মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করার তাগিদ দিয়েছেন। এর মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা গেল :—

(১) যখন কেউ তোমাদের গৃহে আসেন, তাঁকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন কর।

(২) ইহা সদাচরণের উত্তম নমুনা যে, বিদায়ী অতিথিকে বাড়ীর দ্বার পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানাও।

(৩) জাতির মধ্যে তারাই নিকৃষ্ট যারা কোন মেহমাননেওয়াজী করে না।

(৪) তার মধ্যে কোন সদগুণ নেই, যে আতিথেয়তার অনুশীলন করে না।

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখেরাতে বিশ্বাসী সে যেন অতিথিদেরকে সম্মান দেখায়। (আবু দাউদ)

মহানবী (সাঃ)-এর কাছে আতিথেয়তার ক্ষেত্রে স্বধর্মী-বিধর্মী, মোমেন ও কাফেরের প্রভেদ ছিল না। একবার এক ইহুদী তাঁর অতিথি হলেন। যে চাদরে এই ইহুদী শুয়েছিল, পেট খারাপের জন্য ঐ চাদরের উপর মলত্যাগ করে কাউকে কিছু না বলে সে চলে যায়। ব্যক্তিগত কিছু জিনিস রেখে যাওয়ায় পুনরায় ফিরে এসে দেখে মানবদরদী নিজ হাতে ঐ চাদর পানি দিয়ে ধুইছেন। এই অনন্য কাজটি প্রত্যক্ষ করার পর লোকটি মুসলমান হয়ে যায়। আবু বাসরা গাফ্ফারী নামক জনৈক সাহাবী বলেছেন—"আমি যখন কাফের ছিলাম তখন একদিন নবীজি (সাঃ)-এর আতিথ্য গ্রহণ করি। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম। মহানবী (সাঃ) আমাকে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াতে গিয়ে ঘরের সবটুকু দুধ প্রদান করেন এবং তিনি নিজে পরিবারবর্গসহ রাত্রিকালে অনাহারে কাটান।

নাজরানীয় খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে মসজিদে নববীতে সাদরে আপ্যায়ন করেন। তায়েফে সফরকালে আব্দ ইয়াসীনের নেতৃত্বে দুষ্টলোকেরা পাথরে পাথরে মহানবী (সাঃ)-এর শরীর ঝাঁঝড়া করে ফেলে। ৮ম হিজরীতে এই আব্দ ইয়াসীন তার সাথীদের নিয়ে মদীনায় আসলে মহানবী (সাঃ) মসজিদের উঠানে তাদের থাকার জন্য তাবু খাঁটিয়ে দেন এবং এক অপূর্ব মেহমানদারী করেন।

সাহাবী আবু আয়্যুব আনসারীর মেহমান নেওয়াজীর অনন্য দৃষ্টান্ত ঃ

মক্কা থেকে হিজরত করে মহানবী (সাঃ) উপরে উল্লিখিত সাহাবীর ঘরের নীচতলায় অবস্থান করেন। রাত্রিকালে ঘটনাক্রমে এক কলসী পানি পড়ে যায়। পানি নীচে চলে যায় এই আশংকায় আবু আয়্যুব আনসারী ও তদীয় স্ত্রী গায়ের লেপ পানির উপর বিছিয়ে দেন। আল্লাহ্র নবী (সাঃ) তাঁদের মেহমান, যেন কোন কষ্ট না পান সে দিকে খেয়াল রাখতেন। প্রতিদিন খাবার তৈরী করে দুপুরে হুযুর (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসতেন। নবী করীম (সাঃ) খাবার পর যা বেঁচে যেত তা-ই তারা পরিবারের সবাই মিলে খেতেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক মেহমাননেওয়াজীর ধারা পুনঃ প্রবর্তন ঃ

আখেরী যামানায় নবুওয়তে মুহাম্মদীয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে রসূল করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক প্রতিকৃতি আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

যিনি মসীহ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী প্রত্যাদেশ বাণী যোগে এবং ঐশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের প্রিয় কাজ মেহমাননেওয়াজী যা নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে ধর্মের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে আদর্শরূপ লাভ করেছিল সেই মহান আদর্শ পুনঃ প্রবর্তন করেছেন। ইসলামের দাওয়াত নবরূপে প্রচারের সাথে সাথে সমাগত মেহমানদের তিনি প্রথমে ব্যক্তিগত এবং পরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবা করার ব্যবস্থা করেন।

ব্যক্তিগত মেহমাননেওয়াজীর কতিপয় দৃষ্টান্ত :

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক বর্ণনা করেছেন : একবার তিনি লাহোর থেকে কাদিয়ান যান এবং মসজিদে মোবারকে অবস্থানকালে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে তিনি বসতে বলে ভিতর থেকে খাবার নিয়ে আসেন। খাবার শেষে হুযূর (আঃ) নিজেই অন্দর মহল থেকে বিছনা-পত্র নিয়ে আসেন এবং সঙ্গে এক গ্লাস দুধও নিয়ে আসেন।

আর একবার মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব সপ্তাহ খানেক কাদিয়ানে থাকার পর লাহোর রওয়ানা দিচ্ছিলেন; রাস্তায় খাওয়ার জন্য মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজ পাগড়ী থেকে গজ খানেক কাপড় ছিঁড়ে রুটি ও তরকারীর পোট্‌লা বেঁধে দিলেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেন : একবার দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মেহমান আসার দরুন হযরত উম্মুল মোমেনীন ঘাবড়ায়ে গেলেন। গৃহের সব ক'টি কামড়া ছেঁড়ে দিতে হয়। মসীহ মাওউদ (আঃ) উম্মুল মোমেনীনকে এই অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝানোর জন্য এক উপদেশমূলক কাহিনী পেশ করলেন : "একবার এক পথিকের বনের মধ্য দিয়ে সফর করার সময় রাত্রি হয়ে যায়। লোকটি এক বৃক্ষতলে রাত্রিকালে আশ্রয় নেয়। ঐ বৃক্ষের উপর এক জোড়া পাখি ছিল। নর ও মাদী। তারা বলতে লাগলো, লোকটি আমাদের মেহমান, চল, তাঁর শীত নিবারণের জন্য আমাদের বাসা ভেঙ্গে খড়কুটা নিচে ফেলে দিই, লোকটি আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করবে। সত্য সত্যই তারা বাসা ভেঙ্গে নীচে ফেলে দিল এবং লোকটি আগুন জ্বালিয়ে শরীর তপ্ত করতে লাগল। এরপর পাখী-যুগল বলতে লাগলো, "মেহমান আমাদের নিশ্চয় ক্ষুধার্ত। চল, আমরা ঐ প্রজ্জলিত অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি; আমাদেরকে ভুনে মেহমান আহার করতে পারবে। অবশেষে উভয়ই আগুনে ঝাঁপ দিল।"

প্রবীণ সাহাবী মুনসী জাফর আহমদ প্রণীত 'সীরাতে জাফর' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "আসামের মনিপুর থেকে দু'ব্যক্তি বাটালা স্টেশন থেকে টমটম যোগে কাদিয়ানের মেহমান খানায় পৌঁছলে কর্মচারীদের নিকট থেকে ভাল ব্যবহার না পেয়ে তাঁরা বাটালার দিকে প্রায় ৪/৫ মাইল চলে যান। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ খবর পেয়ে অতি দ্রুত হেঁটে গিয়ে মেহমানদ্বয়ের নিকট এ ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনেন এবং রাতে তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে অন্দর মহলে প্রবেশ করেন। অতঃপর এই

মেহমানদ্বয়ের জন্য দুধেরও ব্যবস্থা করেন। সপ্তাহ খানেক তাঁরা সেখানে থাকার পর ফিরে যাবার সময় মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁদেরকে ৪/৫ মাইল পর্যন্ত টাঙ্গার সাথে হেঁটে গিয়ে বিদায় দিয়ে আসেন।

মেহমাননেওয়াজীর প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা :

কাদিয়ানে আগত মেহমান সম্বন্ধে হুযূর বলতেন, মানুষের কাদিয়ানে আসাও এক নিদর্শন। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, মানুষ দূর হতে আসবে এবং এত অধিক সংখ্যক আসবে যে, রাস্তায় গর্ত হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে মসীহ মাওউদ (আঃ) "বায়তুল মাল ফাণ্ড" পুনঃ প্রবর্তন করে মেহমানদের জন্য জাতীয়ভিত্তিক মেহমান খানা কাদিয়ানে প্রতিষ্ঠা করেন। জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে তথায় সম্মানের সহিত মেহমানগণ তিনমাস পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন। এই নমুনা লণ্ডনে বর্তমান হুযূর (আইঃ)-এর তত্ত্বাবধানে চালু রয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর লিখিত পুস্তক ফতেহ ইসলামে জগদ্বাসীকে সত্য ও সততার প্রতি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রচার কার্যকে ৫টি (পাঁচ) শাখায় বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে তৃতীয় শাখা মেহমানদের প্রতিষ্ঠান। "এই প্রতিষ্ঠানের অতিথি সত্যের অনুসন্ধানে ও অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিগণ। তাঁরা যেন দিবারাত্র এই অধমের সাহচর্যে থাকতে পারেন।" একথাগুলো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ফতেহ ইসলাম পুস্তকে মেহমাননেওয়াজী সম্পর্কে বলেছেন।

কেন্দ্রের বাইরে জামাতগুলোতে মেহমাননেওয়াজীর ধারা বিদ্যমান :

আহমদীয়তের প্রচার প্রসারতা বৃদ্ধির দরুন শুধু কেন্দ্রেই নহে কেন্দ্রের বাইরের জামাতসমূহ যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যমান সেখানেও আল্লাহ্‌র মেহমানদের (Guests of God) সমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাইরের জামাতসমূহ নিজেদের ক্ষমতা ও সাধ্য অনুযায়ী মেহমানদের সেবা করে আসছে। সক্ষম জামাতসমূহ এই ধারাকে সজীব রাখার জন্য বাৎসরিক জলসার মাধ্যমে তবলীগ ও মেহমাননেওয়াজীর মহড়া প্রদর্শন করে আসছে।

স্থানীয় জামাতসমূহের করণীয় :

কেন্দ্রের অনুকরণে স্থানীয়ভাবে কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তবলীগ ও মেহমাননেওয়াজীর ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য স্থানীয় ফাণ্ড কায়েম করা যেতে পারে। তবলীগ ও মেহমাননেওয়াজীর ধারা সমান্তরাল না রাখলে ইপ্সিত ফল আশা করা যায় না। আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক সমুজ্জল করে রাখতে হলে মেহমাননেওয়াজীর কাজে সকলের সচেতন হওয়া দরকার। সমবায় নীতিতে স্থানীয় ফাণ্ড গঠন করে অবস্থার মোকাবেলার জন্য 'জামাত'কে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। মেহমানের আগমন যাতে সকলের জন্য আনন্দঘন হয়ে ওঠে তজ্জন্য সকলেরই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

এদিকে সকলের নেক দৃষ্টিতে ফাণ্ড মজবুত হয়ে গেলে মেহমানের অবস্থানের জন্য গৃহের ব্যবস্থা, বিছানা-পত্র ও খাবারের সমস্যা সব কিছু দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ্‌। এ ছাড়া কেন্দ্র থেকে তবলীগ ও মেহমাননেওয়াজীর খাতে গ্রান্টরূপে আর্থিক সাহায্য নিলে এ কাজ আরও সহজতর হতে পারে।

মেহমাননেওয়াজীতে তাহরীকে জাদীদের উপদেশ অনুসরণ করা শ্রেয়ঃ

আহমদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা ১৯৩৪ সনে তাহরীকে জাদীদ প্রবর্তন করার সময় উনিশটি বিষয় (মোতালেবাত) প্রতিপালনের উপদেশ দেন। এগুলোর মধ্যে খাদ্য দ্রব্যে অনাড়ম্বরতা অবলম্বন অন্যতম। খাবারে এক তরকারী ব্যবহার করা একটি মূল্যবান পদক্ষেপ। অবশ্য সম্মানিত মেহমানের ক্ষেত্রে একের অধিক খাদ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। বর্তমান যামানায় মেহমাননেওয়াজীতে নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ না করে নিজেদের খেয়াল খুশীমত কাজ করা হচ্ছে। মেহমাননেওয়াজীর বেলায় অযথা আড়ম্বর প্রদর্শন এবং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি যাতে মেহমাননেওয়াজীর সুন্দর পরিবেশকে বিব্রতকর না করে সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

মোটেল হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট পরিহার করে পারিবারিক ও জামাতি পরিবেশে মেহমাননেওয়াজী চালু করা প্রয়োজন

মোটা অংকের টাকা ব্যয় করে বিলাস বহুল মোটেল, হোটেল বা রেষ্টুরেন্টে উপাদেয় খানা-পিনার ব্যবস্থা না করে পারিবারিক বা জামাতি পরিবেশে মেহমাননেওয়াজীর অভ্যাস গড়ে তোলা শ্রেয়ঃ। এতে অর্থের সাশ্রয় সহ পারস্পরিক সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় হয়। গরীব ভাই আমীরকে দাওয়াত দিলে তখন কোন প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হবে না; রাজনৈতিক দিক থেকে সৃষ্ট দুই শ্রেণী-তত্ত্বের বীজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

তবলীগের ধারা যত বৃদ্ধি পাবে দূরদূরান্ত থেকে কেন্দ্রে লোকের সমাগম ঘটবে

আহমদীয়তের প্রচার তথা তবলীগের ধারা যত বৃদ্ধি পাবে লোক দলে দলে আহমদীয়া জামাতে দীক্ষিত হবে। তাদের জন্য দেশীয় কেন্দ্রে বা আঞ্চলিক কেন্দ্রে সারা বছর ব্যাপী কার্যকর তরবীয়তের ব্যবস্থা করতে হবে। লি ইয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীন—যাতে তারা ধর্মের সম্যক শিক্ষা লাভ করে। বিভিন্ন জাতির লোকদের কিছু অংশ দীনের জ্ঞানের পরিপূর্ণ উপলব্ধি করে 'ওয়ালেইউনযেরু কাওমাহুম'—তারা তাদের নিজ নিজ জাতি বা গোত্রকে সতর্ক করে 'ইয়া রাজাউ' যখন তারা ফিরে যায়। ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা এরূপ কেন্দ্রে নবদীক্ষিতদের অংশ বিশেষকে মেহমাননেওয়াজীর বিরাট দায়িত্ব প্রতিপালন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মহান দাওয়াতি কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও শৃংখলার সাথে পরিচালনার নিমিত্তে ইসলামের এই দ্বিতীয় যুগে পুনরায় জাতীয়ভিত্তিক ফাণ্ড বায়তুল মালের ব্যবস্থা করেছেন। মজলিসে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী এই ফাণ্ডের অর্থ তবলীগ, সমাগত মেহমান এবং সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হয়।

উপসংহার ঃ

মেহমাননেওয়াজী ব্যক্তি ও জাতির মর্যাদার পরিচয় বহন করে তাই মেহমান পরিচর্যায় আমরা যেন খুশীর সহিত নিজদিগকে পেশ করি। মেহমানের নিকট নিজেদের অভাব ও অসুবিধার কথা প্রকাশ না করে আল্লাহ্র কাছে অবস্থা পরিবর্তনের আবেদন জানাই। সেবা করার তৌফীক লাভের জন্য তাঁর দ্বারে বিনয়ের সহিত যেন নিজেকে হাযির করি। আসুন আমরা Guest of God অর্থাৎ আল্লাহ্র মেহমানদের সেবা করে Servants of God-এ পরিণত হই। আমীন।

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

(ষষ্ঠদশ কিস্তি)

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহু)

আরবে কারও শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁর উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করাকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হতো। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বংশ আরবে অতি সম্মানীত ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল আবু কোহাফা এবং মাতার নাম ছিল সালমা। তিনি এমন পুণ্যবান শিশু ছিলেন যিনি বড়দের খুবই সম্মান দেখাতেন। বেহুদা কথা-বার্তার মধ্যে তিনি সময় নষ্ট করতেন না। তিনি বয়সে আঁ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দু'বছরের ছোট ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে আত্মীয়তা ও নেক (পুণ্য)-স্বভাব বিশিষ্ট হওয়ার কারণে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) শিশু কাল থেকেই দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। স্বাস্থচর্চা করা, খেলাধূলা করা এবং নেক লোকদের সাথে উঠা বসা করা, মিথ্যা কথা না বলা, মূর্তিপূজা না করা, মদ ও জুয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা এ উভয় বন্ধুরই অভ্যেস ছিল। বন্ধুত্ব তো তখনই হয় যখন একই প্রকার জিনিষ পসন্দ হয় আর একই প্রকার জিনিস অপসন্দ হয়।

আরবের অধিকাংশ লোকই ব্যবসা করতো। যেসব জিনিস মক্কায় বেশী পাওয়া যেতো তার ব্যবসা করতো। তারা ওগুলো কিনে নিয়ে অন্য কোন শহরে চলে যেতো। সেখানে ওগুলো বেচে দিতো। সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যগুলো কিনে নিয়ে মক্কায় ফিরে এসে বেচে দিতো।

হযরত আবুবকর (রাঃ) কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর আব্বু মক্কার ধনীদের মধ্যে গণ্য হতেন। মক্কায় কেবল ধনী লোকেরাই বসবাস করতেন না বরং গরীব, নিঃসহায়, রোগী ও বৃদ্ধরাও থাকত। খোদাতা'লা হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে এমন স্বভাব দিয়েছিলেন যে, তিনি কারও কষ্ট দেখতে পারতেন না। আরবে যে সময়ে অধিকাংশ লোক মদ্যপানে এবং বেহুদা খেলা-ধূলায় পয়সা খরচ করে অযথা আনন্দ পাবার চেষ্টা করতো সে সময়ে

হযরত আবুবকর (রাঃ) ঐসব কাজে খুশী হতেন যদ্বারা তিনি কাউকে খুশী করতে পারতেন। পয়সা তো তাঁর কাছে ছিলোই। যাকে অভাবী দেখতেন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকেই মনে যত চাইতো দিয়ে দিতেন। আর গ্রহণকারীর চেহারায় আনন্দানুভূতি দেখে তিনিও আনন্দ পেতেন এন্তার। মক্কার বাজারে ঐ দিনগুলোতে মানুষ এভাবে বেচা-কেনা হতো যেভাবে তরি-তরকারী মাংস অথবা খেলনা বেচা কেনা হয়। পরে এসব কেনা লোকদেরকে ঘরে চাকর বানিয়ে রাখা হতো। এদের ওপরে বড়ই নির্যাতন করা হতো। হযরত আবু-বকর (রাঃ) এসব কেনা দাসদের প্রতি বড়ই দয়া করতেন এবং চুপে চুপে তাদের মূল্য আদায় করে তাদের মুক্ত করে দিতেন। ইহা বড়ই সওয়াবের কাজ। লোক যেমনই হোক না কেন সবাই চায় তাদের নেতা যেন ভাল মানুষ হয়। আর হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর গুণাবলী সম্বন্ধে সবাই অবহিত ছিল। তিনি খুবই স্বাস্থ্যবান, সুন্দর যুবক ছিলেন। তাঁর গোত্র বনূ তামীম তাঁকে তাদের নেতা বানিয়ে ছিলো। তিনি ছিলেন নেতা। কিন্তু গর্ব ও অহংকার মোটেই ছিলো না তাঁর। কার কীভাবে সেবা করা যায় তিনি কেবল সর্বদা সেই সুযোগ খুঁজতেন।

যখন বন্ধুদের মাঝে স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশে আলাপ করতে থাকতেন তখন এই কথাই বলতেন যে, লোকেরা পাথরের মূর্তি পূজো করছে। অথচ পাথরের মূর্তি কারও ভাল বা মন্দ করতে পারে না। তাহলে অবশ্যই খোদা অন্য কেউ, পাথরের মূর্তি খোদা নয়। আবুবকর (রাঃ) পাথরের মূর্তি পূজাকে খুবই ঘৃণা করতেন। তিনি যখনই কোন পুণ্য কাজ করতে চাইতেন, গরীবদের সাহায্য করতেন। এতেই তিনি আনন্দ পেতেন। একবার এমন হলো যে, তিনি ব্যবসাসংক্রান্ত ভ্রমণ থেকে ফিরে আসছিলেন তখন কেউ তাঁকে বল্লো, মক্কায় তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সাঃ) বলে বেড়াচ্ছে যে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রসূল। হযরত আবুবকর (রাঃ) সোজা আঁ-হুযূর (সাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ খবর কি সত্যি যে, আল্লাহ্ আপনাকে নবী মনোনীত করেছেন?

তিনি (সাঃ) বল্লেন, হাঁ, হে আবুবকর (রাঃ)! উভয় জগতের স্রষ্টা আমাকে নবী মনোনীত করে দুনিয়ার সংশোধনের দায়িত্ব দিয়েছেন। আঁ হযরত (সাঃ) আল্লাহ্র বাণীকে আরও বেশী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) বলে ফেল্লেন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। আমি মুসলমান হচ্ছি। আমার জন্যে ইহাই যথেষ্ট। আপনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। আপনি যা বলেছেন, সত্য বলেছেন। আমি ঈমান আনছি।

তিনি ঈমান আনয়নকারীগণের মধ্যে প্রথম পুরুষ। মুসলমান হওয়ার কারণে মক্কাবাসী যে অত্যাচার করেছে তা তিনি সহ্য করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রিয় বন্ধুকে পরিত্যাগ করেন

নি। তাঁর ভালবাসা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। তিনি তাঁর সব কিছু ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করে দিলেন। প্রথমে চুপে চুপে তবলীগ করতে ছিলেন। পরে সাধারণ্যে খোলাখুলি-ভাবে তবলীগ করতে লাগলেন তিনি। হযরত বেলাল (রাঃ)-কে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন। মক্কার অবস্থা দিন আর দিন খারাপ হচ্ছিল। পরিশেষে আঁ হুযূর (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সফরের সকল ব্যবস্থা হযরত আবুবকর (রাঃ) করেছিলেন। আর উভয় বন্ধুই একত্রে মক্কা পরিত্যাগ করলেন। রাত ভর এবং পরের দিনও পথ চলতে থাকলেন। দুপুর বেলা তীব্র গরমের কারণে একটি টিলার ওপরে গুহায় কিছু জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে আঁ হযরত (সাঃ)-কে বিশ্রাম করার জন্যে বল্লেন, আর তিনি পাহারা দিতে লাগলেন যে, কোন শত্রু আবার পিছু পিছু নিকটে তো চলে আসে নি! তাঁর দৃষ্টিতে একটি রাখাল পড়লো। তার কাছ থেকে ছাগলের দুধ নিয়ে আঁ হযরত (সাঃ)-কে পান করালেন।

এই গুহায় হুযূর (সাঃ)-এর সাথী হওয়ার কারণে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে গুহা-বন্ধু বলা হয়। গুহাটি অধিক বড় ছিল না। হযরত আবুবকর (রাঃ) বল্লেন, হুযূর শত্রু মাথার ওপরে এসে পড়লো বুঝি! আমি তাদের পা দেখতে পাচ্ছি। যদি তারা একটু ঝুঁকে দেখে তাহলেই আমাদের দেখতে পাবে। আঁ-হুযূর (সাঃ) জবাব দিলেন, চিন্তা কোর না, আমাদের সাথে আল্লাহ্‌তা'লা রয়েছেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) চাচ্ছিলেন যে, আঁ-হুযূর (সাঃ) কিছু বিশ্রাম নিয়ে নিন। কঙ্করময় স্থানে কিইবা আর বিশ্রাম হতে পারে! অতএব কিছুটা গা এলিয়ে দিয়ে আবার রওয়ানা দিলেন আঁ-হুযূর (সাঃ)। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর উরুর ওপরে মাথা রেখে সামান্য একটু শুইয়ে পড়লেন। গুহাটি পুরাতন ও আবদ্ধ ছিল। কোথা থেকে একটি বিষাক্ত পোকা বের হয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পায়ে কামড়ে দিলো। হযরত আবুবকর (রাঃ) অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু নড়া-চড়া করলে তো আঁ হুযূর (সাঃ)-এর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কষ্টের চোটে তাঁর চোখ থেকে পানি বের হলো। এর এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো। তখন হযরত রসূল করীম (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আবুবকর ব্যাপার কি?" হযরত আবুবকর (রাঃ) বল্লেন, কোন একটি পোকা কামড় দিয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী পোকার কামড়ানোর স্থানে তাঁর মুখের থু থু লাগিয়ে দিলেন এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ঐ সময়েই আরাম বোধ করলেন। আঁ হুযূর (সাঃ)-এর বন্ধুকে সবাই সিদ্দীক বলতে লাগলেন। সিদ্দীক অর্থ হলো সত্যবাদী ও বন্ধু।

মদীনায় যুদ্ধের কারণে অধিকাংশ যুদ্ধে যুদ্ধ-সামগ্রীর জন্যে অর্থের প্রয়োজন ছিলো। একবার হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আর্থিক সাহায্যের জন্যে বল্লেন। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সর্বদা এদিকে দৃষ্টি রাখতেন যে, কুরবানীতে তিনি যেন প্রথম হতে পারেন। তিনি তাঁর অর্ধেকটা সম্পদ হুযূর (সাঃ)-এর নিকটে উপস্থাপন করে দিলেন এবং মনে করলেন যে, আজ আমি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর চেয়েও আগে বেড়ে যাবো। পরে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ এনে দিলেন। আঁ হুযূর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আবুবকর ঘরে কি কিছু রেখেছো? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) জবাব দিলেন, ঘরে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর নাম রেখে দিয়েছি।

সিদ্দীকের জন্যে আছে কেবল খোদার রসূল। এভাবে হযরত আবুবকর সকলের চেয়ে আগে বেড়ে গেলেন। খোদাতা'লা তাঁর এ ভালবাসাকে আরও দৃঢ় করে দিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আঁ হুযূর (সাঃ) একাকী হয়ে গেলেন। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ছোট বয়সের আদরের দুলালী আয়েশা (রাঃ)-কে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করে দিলেন যে, হুযূর। আপনি আয়েশাকে (রাঃ) বিয়ে করে নিন। এতে আপনার একাকীত্ব এবং বাচ্চাদের নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে যাবে। একবার একজন সাহাবী হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর! আপনার সবচে' কাকে ভাল লাগে? তখন তিনি জবাব দিলেন। আয়েশা (রাঃ)-কে। তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তার পরে কাকে? তিনি বল্লেন, তার আব্বুকে।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অনেক সময়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ভালবাসার কথা উল্লেখ করতেন। বলতেন, আমার প্রথম বন্ধু তো খোদাতা'লা। খোদার পরে হলো আবুবকর (রাঃ)।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে মুসলমানদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ ছিল। তারা বুঝতেই পারছিলো না যে, আম্মুর থেকে বেশী স্নেহশীল আর আব্বুর চেয়ে অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী, খোদার বাণী প্রচারকারী আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খোদার নিকট যেতে পারেন। হযরত উমর (রাঃ) খুবই রাগান্বিত হয়েছিলেন। বলতে লাগলেন, যে বলবে আঁ হুযূর (সাঃ) মারা গেছেন, আমি তাকে হত্যা করবো। হযরত আবুবকর (রাঃ) ইহা জানতে পারলেন। তখন তিনি একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ছোট খাটো একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি বল্লেন, কুরআন শরীফ থেকে পাওয়া যায়, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রসূল এবং তাঁর পূর্বেও আল্লাহ্র রসূলগণ মৃত্যুবরণ করেছেন (কেবল খোদাই জীবিত থাকবেন)। তিনি এমনভাবে কথাটা বুঝালেন যে, সবাই মেনে নিলো। পরে সবাই মিলে হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচিত করলেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে প্রথম খলীফা। মুসলমানদের প্রাণ দুঃখে ভরা ছিলো। তিনি খলীফা হওয়াতে সবাই স্বস্তি পেলেন। যেসব লোক আঁ-হুযুর (সাঃ)-এর পরে আদেশ মানতে অস্বীকার করলো তিনি তাদেরকে বুঝালেন। তিনি দু'বছর তিন মাস এবং দশ দিন খলীফা থাকার পর মারা যান। খোদাতা'লা তাঁর ওপরে অনেক অনেক আশিস বর্ষণ করুন।

আমি বলেছিলাম যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) গরীবদের অনেক ভালবাসতেন। তোমরা বড় হয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক ঘটনা পড়বে। কিন্তু একটি বড় মজার ঘটনা শুনো। মদীনায় ছিলো এক থুর থুরে বুড়ী। সে চোখে দেখতো না। সে তার নিজের কাজ নিজে করতে পারতো না। হযরত উমর খুব ভোরে তার ঘরে যেতেন এবং তার ঘর পরিষ্কার করে এবং অন্যান্য কাজ করে দিয়ে আসতেন। একদিন হযরত উমর (রাঃ) গিয়ে দেখেন কাজকর্ম কে যেন করে দিয়ে গেছে। পরের দিনও ঐ একই অবস্থা। হযরত উমর মনে মনে ভাবলেন, কে এই লোক, যে তার সেবাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। চুপ করে তিনি বসে থাকলেন পরের দিন। ভোরের আঁধার তখনও কাটেনি। এক ব্যক্তি বুড়ীর গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বের হয়েছে। তখন হযরত উমর (রাঃ) দেখলেন, ঐ ব্যক্তি আর কেউ নন তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক। এথেকে অনেক কথা জানা যায়। এর মধ্যে একটি কথাতো এই যে, পুণ্যবান লোক সর্বদা খোদার সন্তুষ্টি লাভ করার সুযোগ খুঁজেন। যদি কেউ এ সুযোগ ছিনিয়ে নেয় তাহলে তিনি দুঃখ পান। আমরা যে কাউকে সাহায্য করতে পারি—পয়সা দিয়ে, নিজ হাতে কাজ করে দিয়ে, রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে, কোন রুগীকে ঔষধ খাইয়ে দিয়ে প্রভৃতি আরও অন্যান্য ভাবে··· ····। (চলবে)

(৪৬ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

মৃত্যুকালে মাসুদুল হক সিরাজী সাহেবের বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৪ বৎসর। মৃত্যুর সময় প্রবাসে অবস্থানকারী এক মেয়ে তিন পুত্র চার নাতি-নাতনীসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। ১১ই সেপ্টেম্বর, '৯৬ দুপুর ৩-২৫ মিনিট-এ সত্যবাদী নিরহংকারী মাসুদ সিরাজী হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে··· রাজেউন)। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমরা তাঁর দারাজাতের বুলন্দী কামনা করি। তার পরিবারকে আল্লাহ্‌তা'লা সাব্‌রে জামীল দান করুন। আমীন।

নেসার আহমদ
চট্টগ্রাম

সংবাদ

o মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের এ্যাপেনডিসাইটিসের অপারেশন হয়েছে ১৪/৯/৯৬ তারিখে। তিনি গত ২৩/৯/৯৬ তারিখে ক্লিনিক থেকে বাসায় চলে গেছেন। আমীর সাহেব দ্রুত আরোগ লাভ করছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। তাঁর পরিপূর্ণ ও সার্বিক সুস্থতার জন্যে এবং যাতে শীঘ্র নিজ বিরাট দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন সেজন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

o হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জনাব তবারক আলী সাহেবকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের অন্যতম ন্যায়েব ন্যাশনাল আমীর ও জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হক সাহেবকে সেক্রেটারী জিরাআত নিযুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, আরেকজন নায়েব ন্যাশনাল আমীর হলেন জনাব মকবুল আহমদ খান। তাঁরা যাতে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারেন সেজন্যে সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
অফিস সেক্রেটারী

o আল্লাহ্তা'লার অসীম কৃপায় গত ১৩/৯/৯৬ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া গাজীপুরের উদ্যোগে "তরবীয়তের গোড়ার কথা" পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সন্তান লাভ

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ ইং তারিখ রোজ সোমবার দিন ১২ ঘটিকায় আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। নবজাতকের সার্বিক কল্যাণের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

নাজমুল আশ্রাফ ও সাজেদা আশ্রাফ
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

মাসুদ সিরাজীকে যেমন দেখেছি

অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মাসুদুল হক সিরাজী জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার ছাতিনা নামক গ্রামে। তিনি দেশ বিভাগের সময় মেঝ ভাই লুৎফুল হকের সহযোগিতায় বীর চট্টলায় আগমন করেন এবং চাকুরী জীবনের শুরুতেই হালীশহর নিবাসী আবদুল গফুর সিরাজীর তবলীগে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। সদা হাস্যোজ্জল, অতি বিনয়ী, ধৈর্যশীল, নিরহংকার মাসুদুল হক সিরাজী জীবদ্দশায় পর্যায়ক্রমে ছিলেন চট্টগ্রাম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, আনসারুল্লাহর যয়ীম, তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারী, স্থানীয়

জলসা কমিটির চেয়ারম্যান, শত বার্ষিক জুবিলী উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদ এবং পরবর্তীতে তালীম তরবীয়ত, শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। চট্টগ্রাম বিভাগের ওয়াকফে নও-এর সুপারভাইজার হিসেবে জামাতের খেদমত করেছেন তিনি।

তিনি ছিলেন একজন ওসীয়্যতকারী এবং ওসীয়্যত-এর ভাগ-বন্টন জীবদ্দশায় সম্পন্ন করে গেছেন। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে প্রতি শুক্রবার ক্লাসের বিশেষ উদ্যোগ নেন এবং নিজেও ছাত্র হিসাবে তালীম গ্রহণ করতে থাকেন। জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হালকায়-হালকায় গিয়ে উপস্থিত হতেন। কাদিয়ান জলসায় যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ওয়াফ্ কে আরজীতে অংশ গ্রহণ করতেন। দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন নামে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তবলীগ প্রোগ্রামে লিখনীর মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করতেন। পাকিস্তানের রাবওয়াতেও জলসায় যোগদান করেন তিনি।

তিনি শুধু আহমদীদের নয়, যারা আহমদীয়ত গ্রহণ করেন নি তাদের খোঁজ-খবরও নিতেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া মাত্রই বিশেষ করে নন-আহমদী লোক ছুটে আসে তাঁরই নাসিরাবাদস্থ বাস ভবন আপন নিবাসে। কুরআনে হাকেম পেশায় হোমিও ডাঃ বলেন, তাকে চেয়ার কিনে দিয়েছেন। ঠেলা গাড়ি চালক বলেন, তাকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। এক বৃদ্ধ মহিলা বলেন, মাঝে মাঝে তরি-তরকারী কিনে পাগল মেয়ের জন্য বাসায় দিয়ে আসতেন। এই সমাজ সেবক মাসুদুল হক সিরাজী ডাক বিভাগে কর্মজীবন শেষে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত অবস্থায় স্থানীয় মাস্তান কর্তৃক চাঁদার জন্য আক্রান্ত হন, সত্যকে ভালবাসতে গিয়ে বলেন, পকেটে পঞ্চাশ টাকা আছে নিলে নিতে পার। মস্তান পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যায় কিন্তু পরবর্তী ৩ বা ৪ দিন পরে ঐ পঞ্চাশ টাকা ফেরৎ দিয়ে যায় এই সত্যবাদী মাসুদ সিরাজীকে।

প্রতি সন্ধ্যায় অফিস শেষ করে আঞ্জুমান প্রাঙ্গণে আসতেন তিনি। গেইটে প্রবেশ করে আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রেখে বাথরুমে নিজ হাতে পানি ঢেলে ও পরবর্তীতে নামাযের জন্য প্রস্তুতি এবং সকলকে নিয়ে জামাতের কাজ রাত নয়টা কিংবা দশটা পর্যন্ত সম্পাদন করতেন। বাসায় ফিরার সময় কিছু হাঁটতেন। বাকী পথ রিক্সায় বা বাসে করে ফিরে যেতেন সুখের নীড়ে অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্রদের কাছে। তার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

আহমদী বাচ্চারা বিশেষ করে ওয়াফকে নও বাচ্চারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাসুদ সিরাজীকে 'হুযুর' হিসাবে ডাকতো। তাই বেশ কিছু বাচ্চা তাদের ভাষায় হুযূরকে 'মৃত' বলতে চায় নি। কোন কোন অভিভাবককে রাতে তাদেরকে কবরের স্থানে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তাদের একজন হল প্রবীণ আহমদী সৈয়্যদ খাজা আহমদ-এর বড় মেয়ের নাতি।

(অবশিষ্টাংশ ৪৪-এর পাতায় দেখুন)

হাসপাতাল থেকে লেখছি

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আহমদী পত্রিকার বিগত কয়েকটি সংখ্যায় লণ্ডন থেকে, নিউইয়র্ক থেকে এবং ক্যালিফর্নিয়া থেকে লিখেছি। এবার লিখছি হাসপাতাল থেকে। আকাশ (বিমান) পাতাল (পাতালরেল) থেকে নয় সম্পূর্ণ—ভিন্ন পরিবেশ—হাসপাতাল থেকে লিখছি।

পঞ্চাশ দিন ইউরোপ আমেরিকায় সফরে থাকার পর দশ সেপ্টেম্বর বিকাল বেলা দেশের মাটিতে পা রাখলাম। মুকর্রম নায়েবে আমীর সাহেব, কতিপয় আমেলা সদস্য, খোদ্দাম সদস্য সহ আমার পরিবার পরিজনও বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।

শুক্রবার জুমআর খুতবায় আমার সফরের আকর্ষণীয় বিষয়গুলি বলব বলে ঠিক করলাম। কিছু নোট নেব ভাবলাম কিন্তু পারলাম না। ভাল লাগছিল না। রাতে নাম মাত্র খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। মধ্য রাতের পর পেটে তীব্র ব্যথা শুরু হল। ফজর পর্যন্ত চলল। কাউকে ডাকলাম না ঘুম ভাঙ্গালাম না। আমার বিবি টের পেয়ে জেগে উঠলেন। কিছুক্ষণ পর তবশীর তার খালুকে (ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন প্রফেসর) ফোন করল, তিনি এলেন। এসেই রক্ত পরীক্ষা ও এক্সরে করতে বললেন। আরো বললেন যে, একজন সার্জনকে খবর দিচ্ছি আপারেশন লাগতে পারে। মনে হয় এপেণ্ডিসাইটিস। এ্যাপেনডিক্স দেহে কোন কাজে লাগে তা আজো ডাক্তাররা স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। তবে এটি যে অহেতুক স্রষ্টা সৃজন করেননি সে বিশ্বাস আমার আছে। রাব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান। খুব সম্ভব অতি শিশুকালে এটির খুব প্রয়োজন। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর কাজ ফুরিয়ে যায়। অনেক সময় এতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, মারাত্মক বেদনা হয়। অনেক সময় মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ডাক্তাররা বলেন, বৃদ্ধদের জন্য, ডায়বেটিক রোগীর জন্য এবং গর্ভবতীদের জন্য এটি উপেক্ষা করা যায় না। ফেঁটে গেলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। আমি এমনিভাবে একজন আহমদীকে মরতে দেখেছি।

শুক্রবার দিবাগত রাতেই আমাকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হল। শনিবার সকালে অস্ত্রোপচার করা হল। চিকিৎসা জগতে এনেস্‌থেশিয়া এক অদ্ভুত আবিষ্কার। আমার দেহের উপর যা করা হল তার কিছুই টের পেলাম না। হুশ যখন হল আমি বিশেষ হেফাযতি কক্ষে। জিজ্ঞেস করলাম, কত ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছে। তবশীর বলল, চার ওয়াক্ত। ইশারায় পড়ে নিলাম। মৃত্যুর পর মানুষ কেমন থাকে জানি না। কোন জীবিত মানুষেরই এই অভিজ্ঞতা নেই। তবে আমার মনে হল আমি ঘুমের রাজ্য থেকেও বহু দূরে কোথাও ছিলাম।

আল্লাহ্ আমার প্রাণটাকে রেখে দিতে পারতেন, কিন্তু না, ফিরিয়ে দিলেন। হয়ত আরো কিছু কাজ আছে তা এখন সম্পাদন করতে হবে। কেবিনে আসার পর আত্মীয়-স্বজন এসেছেন একের পর এক। আহমদী বন্ধুরাও এসেছেন অনেকেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিব্রত বোধ করলেন। এত লোক আসলে রোগীর ক্ষতি হবে, ইনফেকশন হবে। কেউ যেন হাসপাতালে না আসেন এজন্য এলান করা হল। অনেকেই বাধ্য হয়ে আসা বন্ধ করলেন। তবে আমি তাদের হৃদয়ের স্পন্দন টের পেয়েছি রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে। হুযূরকে (আইঃ) ফ্যাক্স করা হল। জুমআয় দোয়ার এলান করা হল।

ক্যালিফর্নিয়া থেকে ঢাকা পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ ঘন্টা বিমানে ছিলাম। যদি ঐ সময় বেদনা উঠত তাহলে যে, কী হত তা একমাত্র আল্লাহ্তা'লাই ভাল জানেন। মহাশূন্যে যে কি করা হত তা এখন কল্পনারও বাইরে। অসুখ বিসুখ তো জীবনের সাথী। কমবেশী সবারই অসুখ হয়ে থাকে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, লি কুল্লে দাইন দাওয়াউন। রোগ মাত্রেরই ঔষধ আছে। ঐ ঔষধ আবিস্কার করা মুসলমানের দায়িত্ব। ডায়বেটিস রোধ করা, এপেণ্ডিসাইটিস কেন হয় এসব নিয়ে গবেষণা করে ঔষধ আবিস্কার করা মুসলমানের দায়িত্ব। উল্লেখ্য যে, ইনসুলিন কোন ঔষধ নয়—হরমোন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকথিত মুসলিম ওলামারা ঔষধ আবিস্কার না করে পানি পড়া দেন, তাবিজ কবজ দেন। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! তবে হ্যাঁ, আমাদেরকে শুধু ঔষধের উপর নির্ভর করলেই চলবে না তৎসঙ্গে দোয়ার সাহায্য নিতে হবে। জামাত আমার জন্য সদকা করেছে, বন্ধুরা দোয়া করছেন। আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন, আমীন! এখন আমি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে দু'একটি কথা বলতে চাই। আশাকরি এই অসুস্থ ভাইয়ের কথাগুলি সবাই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবেন ঃ

১। হুযূর (আইঃ) লণ্ডনে আমার সঙ্গে আলাপকালে বাঙ্গালীদের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিক পরিবর্তনকে আল্লাহ্র সাহায্য বলেছেন।

২। ব্যাপকভাবে তবলীগের নির্দেশ দিয়েছেন। নূতন নূতন পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

৩। তিনি সর্বদা বিভিন্ন সময়ে জামাতের কর্মকর্তাদেরকে ভেদাভেদ ভুলে এক দেহ এক প্রাণ হয়ে কাজ করতে বলেছেন।

৪। আমীরের নেতৃত্বে 'কেন' 'কিন্তু' ইত্যাদি প্রশ্ন না করেই কাজ করতে হবে [হুযূরের (আইঃ) ভাবকে আমার ভাষায় বর্ণনা করছি] মান, অভিমানের কোন সুযোগ এখানে নেই [খালেদের (রাঃ) নমুনা এর উজ্জল দৃষ্টান্ত]।

৫। যারা বিশেষ অপারগতার কারণে কাজের জন্য সময় দিতে পারেন না তারা

(অবশিষ্টাংশ ৫০-এর পাতায় দেখুন)

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

ইহার উপর দৃষ্টি পতিত হয়। কিন্তু এর কার্যকারণ একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। তাহলে অসংখ্য অতিথি সেবা আছে যা আত্মীয়তার খাতিরে, প্রীতি ও ভালবাসার খাতিরে হয়ে থাকে; বাধ্যবাধকতার দরুন, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেও করা হয়ে থাকে। ওসব অতিথি সেবার কদর আসমানে হয় না। কিন্তু আল্লাহ্‌র খাতিরে যে আতিথেয়তা করা হয় তা আর পার্থিব থাকে না ঐশী হয়ে যায়।"

একটি সময়োচিত সতর্ক বাণী

মুসলমান মসজিদে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৪ জন নিহত

মুলতান রয়টার/এপি * চারজন বন্দুকধারী গতকাল সোমবার পাকিস্তানের মুলতান নগরীতে একটি সুন্নী মসজিদে আক্রমণ চালিয়ে ২৪ জনকে হত্যা এবং আরও ৩৫ জনকে আহত করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে ... ... এ হত্যাকাণ্ডের জন্য জঙ্গী শিয়াদের দায়ী করা হয়। ... ... (দৈনিক সংগ্রাম ২৪/৯/৯৬)

পাকিস্তানে এ ধরনের ধর্মীয় হানাহানি অহরহ চলে আসছে। গত ২ দশকে পাকিস্তানে ধর্মীয় হানাহানি ও দাঙ্গায় কয়েক হাজার লোক নিহত হয়েছে। কোন এক ফের্কার মসজিদে অন্য কোন ফের্কার লোকেরা তাণ্ডব ঘটালে তারাও এর পাল্টা ব্যবস্থা না নিয়ে বসে থাকবে না। ফলতঃ ইহা ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। তাই ইহা অনভিপ্রেত ও অনইসলামিক। এরকম পরিস্থিতির যে উদ্ভব হবে তা আহমদীয়া জামা'ত পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিয়েছিলো। পাকিস্তান সংসদ যখন আহমদীদেরকে অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণা করতে যাচ্ছিলো তখন সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিলো—

"এই প্রেক্ষাপটে যদি পাকিস্তানের বিগত যুগ ও বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হবে যে, যদিও বর্তমান পর্যায়ে শুধুমাত্র জামা'তে আহমদীয়াকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমনদের সুদীর্ঘকালীন পরিকল্পনাধীনে মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্যান্য ফির্কাগুলোর বিরুদ্ধেও ফেৎনার এক সুপ্রশস্ত পথ নিশ্চয় প্রস্তুত ও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ ১৯৫৩ইং সনের পর থেকেই আহমদীদের ছাড়াও কতিপয় অন্যান্য ফের্কাকে অমুসলিম সংখ্যালঘু করার আওয়াজ উত্থাপিত হতে শুরু করেছে"। (মাহযারনামা)

উপরোক্ত সতর্কবাণীর প্রতি দৃক্‌পাত না করার ফলে পাকিস্তানে বিগত ২ দশকে যা ঘটেছে ও ঘটছে তা সচেতন ব্যক্তি মাত্রই অবহিত। আজও বাংলাদেশে আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলমান সংখ্যালঘু করার নিমিত্তে যদি কোন না-পাক হস্ত উত্থিত হয় তাহলে বাংলাদেশেও যে পাকিস্তানের পুনরাবৃত্তি হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির লোকদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা এথেকে রক্ষা করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আমরা এই কামনা করছি।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রথিতযশা সম্পাদক মৌলানা আব্দুল মন্নান সালেক ১৯৫২ইং সনে পাকিস্তান সরকারকে যে আন্তরিক ও বিজ্ঞোচিত পরামর্শ দিয়েছিলেন তা-ও স্মরণ করা যেতে পারে :

"আমাদের কাজ শুধুমাত্র এতটুকু যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'তে বিশ্বাসী ও এর প্রতি স্বীকৃতিদানকারী প্রতিটি ব্যক্তিকেই যেন আমরা মুসলমান জ্ঞান করি এবং মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দেয়া চিরতরে বর্জন করি। বরং সময় এসেছে ইসলামী সরকার যেন মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যাদানকে আইনতঃ, দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন যাতে ইসলামী সমাজ এ অভিশাপ হতে চিরকালের জন্যে মুক্তি পায়।"

(দৈনিক আফাক, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫২ইং)

(৪৮-এর পাতার পর)

আমীরের সঙ্গে আলাপ করে, অসুবিধার কথা বলে তার পদে অন্য কাউকে নিয়োগ করার পরামর্শ দিতে পারেন। অসহযোগিতা বা পদত্যাগ করতে পারেন না। এটাই জামাতের নিয়ম। কথাগুলি শুধু এবারের জন্য নয়, এগুলি সার্বজনীন। অনেকের ধর্মীয় শিক্ষা না থাকায় বিষয়গুলি ভালভাবে বুঝতে পারেন না। আমীর যাকে ইচ্ছা যে কোন কাজ দিতে পারেন আবার কোন কৈফিয়ৎ না দিয়েই বাতিল করতে পারেন। ইসলাম অর্থই আত্মসমর্পণ। বন্ধুগণ, তাকওয়া অবলম্বন করুন, পার্লামেন্টারিয়ান হবেন না। হুযুর (আইঃ) আমাকে সেক্রেটারীদেরকে প্রয়োজনে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেও আমি পারত পক্ষে তা করতে চাই না।

আমরা একটি পরিবার। পরিবারের সবাই সমান নয়। কেউ সবল, কেউ দুর্বল। তাই দুর্বল সবলকে ধরে উঠবে আর সবল দুর্বলকে ধরে রাখবে। ধর্ম অর্থও তাই। দু'দিক দিয়ে ধারণ। তাহলে পতনের সম্ভাবনা থাকবে না।

আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, আল্লাহ্‌র মার সীমারবার। মিঃ ভুট্টো জামাতের ক্ষতি করে মৃত্যু বরণ করেছিল। তার একপুত্র অনেক আগেই অপমৃত্যুর কবলে হারিয়ে যায়। হাসপাতালে বসে শুনলাম ভুট্টোর দ্বিতীয় পুত্রের অপমৃত্যুর কথা। ভুট্টো বংশের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে একে একে। অতএব, এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কাবুলের শহীদানের রক্ত আজো শতবর্ষ ধরে সেখানে রক্ত ঝরাচ্ছে। জানি না এর শেষ কোথায় ?

ভাই ও বোনেরা আমার ! ইস্তেগফার পড়ুন, দরূদ শরীফ পাঠ করুন। আল্লাহ্‌র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় সাধ্যমত ব্যয় করুন। আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হবে আপনাদের উপর, আপনাদের আওলাদের উপর।

আমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ যেন আমাকে তাঁর কাজ করার যোগ্য করে দেন, কর্মক্ষম স্বাস্থ্য দান করেন। আমার জীবন এবং মরণ যেন আল্লাহ্‌র জন্য হয়, আমীন !

রাব্বিশ্‌ফিনী শেফায়ান কামেলান আজেলান লা ইউগাদেরু সাকামান। আমীন।

সংশোধনী ঃ

বিগত সংখ্যায় আহমদীর ৩৯ পৃষ্ঠার ২৫ ছত্রে "দূরত্ব প্রায় ছয় ঘন্টা" স্থলে "বিমানে দূরত্ব প্রায় ছয় ঘন্টা" পাঠ করতে হবে।

সম্পাদকীয়

মেহমাননেওয়াযীর গুরুত্ব

মেহমাননেওয়াজী বা আতিথেয়তা একটি মানবিক সৎ গুণ। ইহা নবীদের (আঃ) সুন্নত। মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনে নবীদের (আঃ) মেহমাননেওয়াযী সম্বন্ধে বহু ঘটনার উল্লেখ এসেছে। আমাদের প্রিয়-নবী—বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আতিথেয়তা সম্বন্ধে বহু ঘটনা পবিত্র হাদীস গ্রন্থাবলীতে বিধৃত হয়েছে। আধ্যাত্মিক খাদ্য সরবরাহের সাথে সাথে মানুষের দৈহিক খাদ্যের সমাধান করা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কুরআন মজীদে নামায কায়েম করার সাথে সাথে যাকাত আদায় করার কথা বার বার নির্দেশ করা হয়েছে। এর কারণ কি? নামাযে আমরা ইসলামী সমাজের একটি চিত্র, একটি নক্শা তথা একটি রূপ রেখা দেখতে পাই। তবে এই রূপ-রেখা কার্যকরী করার জন্যে যে বিষয়টি খুবই গুরুত্ববহ ও প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে তাহলো মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করা। পেটে ক্ষুধা থাকলে ধর্মের কথা বিস্বাদপূর্ণ মনে হতে পারে। তাই ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষের পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্যে যাকাত ব্যবস্থার প্রতি খুব জোর দেয়া হয়েছে ইসলামে।

ইসলামের দ্বিতীয় বিকাশের সময়ে ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালামও এই সুন্নতকে সদা জাগ্রত ও সমুন্নত রেখেছেন। মেহমানদের সুযোগ সুবিধা, আরাম আয়েশের প্রতি তিনি সর্বদা ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য রাখতেন। আর পরে এ উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণভাবে ও সাংগঠনিকভাবে বাস্তবায়নের জন্যে তিনি 'ফতেহ ইসলাম' নামক পুস্তকে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে যে কয়টি বিশেষ পদক্ষেপকে চিহ্নিত করেছেন তন্মধ্যে মেহমাননেওয়াযী অন্যতম।

প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও সাধু ব্যক্তিগণের সাহায্যে লাভের জন্যে পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ কেন্দ্রে সম্মিলিত হন। এমন কি নবদীক্ষিতগণের তালীম তরবীয়তকল্পে তাদেরকেও কেন্দ্রে আনা জরুরী। তাই তাদের থাকা-খাওয়া আপ্যায়ন ইত্যাদির জন্যেও মেহমান-নেওয়াযীর গুরুত্ব অপরিসীম। এদিকে লক্ষ্য রেখেই জামা'তের বায়তুল মালে মেহমাননেওয়া-যীর খাত বরাদ্দ করা হয়েছে। কাদিয়ান, রাবওয়া, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে দারুয্ যিয়াফত, মেহমানখানা ও লংগরখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে অনেক আগ থেকেই। দুঃখের বিষয় আমরা বাংলাদেশ কেন্দ্রে এ ধরনের দারুয-যিয়াফতের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে এখনও সক্ষম হইনি। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে জামা'ত এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, ইনশাআল্লাহ্।

মেহমাননেওয়াযীর গুরুত্ব সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ৩০-৮-৯৬ তারিখে জার্মানীর খুতবায় বলেছেন, "বরং ইহা একটি জ্যোতিষ্মান সৎ গুণ। আসমান থেকে

(অবশিষ্টাংশ ৪৯ পাতায় দেখুন)

6th Issue 30th September, 1996
Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM Tv AHMADIYYA
INTERNATIONAL

মুসলিম টেলিভিশন আহ্মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করছে। প্রতি শুক্রবার নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে শুনতে পাবেন।

আহ্মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272